ISSN 1605-7023

পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪০৭, নভেম্বর ২০০০

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

৫ম বর্ষ সংখ্যা — কার্তিক ১৪০৭

সম্পাদনা পর্ষদ

ডঃ একরাম হোসেন	চেয়ারম্যান
মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	সদস্য
ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান	,,
আয়েশা আজিম	,,
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	,,
গোলাম মোস্তাকীম	,,

সম্পাদক ঃ বনিক গৌর সুন্দর

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 5th Year Issue, Kartik, 1407
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকাল ঃ কার্তিক ১৪০৭, নভেম্বর ২০০০

পি এ টি সি গ্রন্থাগার ঃ ০৫০.৩৫

টেলিফোন ঃ ৭৭১০০১০-১৫
টেলেক্স ঃ ৬৩২২২৮ পি এ টি সি বিজে
ফ্যাক্স ঃ ৭৭১০০২৯
ই-মেইল ঃ bpatc@bangla.net bpatcppr@bangla.net
admnpatc@bangla.net

গ্রাহক হওয়ার জন্য
যোগাযোগ ঠিকানা ঃ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

বিনিময় ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রনে ঃ ইছামতি অফসেট প্রেস
১/১ ডিআইটি রোড, হাজীপাড়া,
ঢাকা-১২১৭।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচীপত্র

১। পশু সম্পদ, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও গৃহীত সরকারী পদক্ষেপঃ একটি পর্যালোচনা — ১
খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব

২। বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার — ১৭
এ এম এম রেজা-ই-রাব্বী

৩। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ — ৪৫
মোঃ হাসিবুর রহমান

৪। থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ প্রক্রিয়া — ৫৫
মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

৫। সিটিজেন চার্টারঃ একটি মাইল ফলক — ৮৯
মোঃ তোফাজ্জল হোসেন

৬। তামাকের শোষণমূলক বিপনন ব্যবস্থা — ১০৫
গোলাম মোস্তাকীম

৭। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা — ১২১
মাইনউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

৮। পুস্তক সমালোচনা ঃ — ১৪৩
বইয়ের নাম ঃ নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন
লেখক ঃ মতিউর রহমান গাজ্জালী
শ্যামল কুমার দাস

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা। অনিবার্য কারণে দীর্ঘদিন পত্রিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পত্রিকার গত সংখ্যা (কার্তিক ১৩৯৭) প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৪০১ বঙ্গাব্দে। এখন থেকে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি (৫ম বর্ষ সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৭) প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। পত্রিকায় সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। পত্রিকাটি পাঠকদের হাতে নিয়মিতভাবে তুলে দেবার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

বণিক গৌর সুন্দর
সম্পাদক
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

পশু সম্পদ, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও গৃহীত সরকারী পদক্ষেপঃ একটি পর্যালোচনা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব*

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে অবদানের দিক থেকে কৃষি খাত একক ভাবে সবচেয়ে বড়খাত। ১৯৯৬-৯৭ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) কৃষিখাতের অবদান ছিল ৩২.৪ ভাগ।[১] কৃষিখাত শুধু খাদ্যের যোগানই দেয় তাই নয়, বরং জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত এই দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। এক হিসেবে বলা হয় দেশের মোট কর্ম সংস্থানের ৬৩ ভাগই সৃষ্টি কৃষিখাত হতে।[২] ১৯৯৬-৯৭ সালে দেশের মোট রপ্তানীতে একক ভাবে কৃষিখাত প্রাথমিক পণ্যের অবদান শতকরা ১২ ভাগ।[৩] এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য বিশেষ করে পাট ও চামড়া রপ্তানীতে কৃষিখাতের অবদান উল্লেখযোগ্য যা মোট রপ্তানীর ১২ ভাগ।[৪] সুতরাং গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরী পোশাকের পরই রপ্তানীতে কৃষির অবদান সর্বাধিক। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র দূরীকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করছে। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অর্থনীতির সবচে বড় এই খাতটি কয়েকটি উপ-খাতের সমন্বয়ে গঠিত। কৃষির এই উপ-খাতগুলি হলোঃ

১। শস্য উপ-খাত;
২। মৎস্য উপ-খাত;
৩। পশুপালন উপ-খাত; এবং
৪। বনজ সম্পদ উপ-খাত।

কৃষি সম্পদের সার্বিক অবদান এই উল্লেখিত উপ-খাত গুলির যোগফল মাত্র। এই উপ-খাতগুলোর মধ্যে, সর্বাধিক অবদান শস্য খাতের। ১৯৯৭-৯৮ (সাময়িক) সালে সামগ্রিক দেশজ উৎপাদনে এই খাতের অবদান ধরা হয় ২২.৯ ভাগ অন্যদিকে অন্যান্য উপ-খাত যেমন, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ এবং বনজ সম্পদের অবদান ধরা

---

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

১। বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৮ (ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রনালয়, ১৯৯৮) পৃঃ ১৩

২। বাংলাদেশ সরকার, বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৯৬, বাংলাদেশ *অর্থনৈতিক সমীক্ষা* পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৫

৩। পূর্বোক্ত

৪। পূর্বোক্ত

হয় যথাক্রমে ২.৩ ভাগ, ৩.২ ভাগ এবং ৩.৩ ভাগের মত।[৫] অর্থাৎ একমাত্র শস্য উপ-খাত ছাড়া সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক খাত কৃষির অন্যান্য উপ-খাতগুলির অবদান যৎসামান্যই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কৃষি খাত একক বৃহত্তম খাত হলেও এর অন্যান্য উপ-খাত গুলোর অবদান খুব সামান্যই। নিম্নের সারনী-১ এর মাধ্যমে দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাত এবং এর উপ-খাতসহ অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাত সমূহের অবদান দেখানো হয়েছে।

সারণী - ১

দেশজ উৎপাদনে খাতওয়ারী অবদান (%) (১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যে)

খাম সমূহ	১৯৯৭-৯৮ সাময়িক
ক) শস্য	২২.৯
খ) বনজ সম্পদ	২.৩
গ) পশু সম্পদ	৩.২
ঘ) মৎস্য সম্পদ	৩.৩
১. কৃষি (ক+খ+গ+ঘ)	৩১.৭
২. পরিবহন সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১২.৩
৩. বাণিজ্যিক সেবা	১০.২
৪. শিল্প	১১.৩
৫. পেশা ও বিবিধ সেবা	১২
৬. অন্যান্য	২২.৫
মোট	**১০০.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ১৯৯৭-৯৮ সালের হিসাব সাময়িক

সারনী - ১ হতে এটা সুস্পষ্ট যে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির সার্বিক অবদান সর্বাধিক হলেও শুধুমাত্র শস্য উপ-খাত ছাড়া অন্যান্য উপ-খাতের অবদান যৎসামান্যই।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদ খাতের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও পশু সম্পদ উপ-খাতের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান আশানুরুপ নয়। নিম্নে এই উপখাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হলোঃ

- ❒ দেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আসে দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পশু সম্পদ উপ-খাতের

৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩

অবদান কতটুকু। শুরুতেই বলা হয়েছে যে, দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশুসম্পদ উপ-খাতের অবদান খুব বেশী নয়।

নিচের সারণী-২এ কৃষিতে কৃষি উপ-খাত সমূহের অংশ দেখানো হয়েছে।

সারণী - ২

কৃষিতে কৃষি উপ-খাত সমূহের অংশ (%) (১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যে)
(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাগুলো প্রকৃত আর্থিক অবদান বুঝাচ্ছে, কোটি টাকা)

উপ-খাত	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮ (সাময়িক)
শষ্য	৭৮.৮৮	৭৮.৪৬	৭৭.৭২	৭৬.২০	৭৪.১০	৭৩.৪৭	৭৩.২৯	৭২.২৩
	(১৫২৫৭)	(১৫৫১০)	(১৫৬৩৯)	(১৫৩৮৫)	(১৪৮০৭)	(১৫২১৭)	(১৬১৫৭)	(১৬৪১৯)
মৎস্য সম্পদ	৭.১৯	৭.৪৯	৭.৮৪	৮.৪৯	৯.৪১	৯.৬১	৯.৮১	১০.৩৩
	(১৩৯০)	(১৪৮০)	(১৫৭৮)	(১৭১৫)	(১৮৮০)	(১৯৯১)	(২১৬৩)	(২৩৪৯)
পশু সম্পদ	৭.২৯	৭.৪০	৭.৭১	৮.৩৪	৯.১৩	৯.৫১	৯.৬৫	১০.১১
	(১৪১০)	(১৪৬১)	(১৫৫২)	(১৬৮৪)	(১৮২৪)	(১৯৭১)	(২১২৮)	(২২.৯৮)
বনজ সম্পদ	৬.৬৪	৬.৬৫	৬.৭৩	৬.৯৭	৭.৩৬	৭.৪১	৭.২৫	৭.৩৩
	(১২.৮৫)	(১৩১৫)	(১৩৫৪)	(১৪০৮)	(১৪৭১)	(১৫.৩৪)	(১৫৯৮)	(১৬৬৭)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উল্লেখিত *বাংলাদেশ ইকোনোমিক সার্ভে* ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫ ও ৯৭

সারণী-১ এ এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশের কৃষি উৎপাদনে পশু সম্পদ উপ-খাতের অবদান যৎসামান্যই। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে কৃষিতে পশু সম্পদ উপ-খাতের অবদান ছিল ৭.২৯ ভাগ যা ১৯৯৭-৯৮ (সাময়িক) অর্থ বছরে বেড়ে দাড়ায় ১০.১১।

❒ সাম্প্রতিক কালে পশুসম্পদ দেশের সমষ্টিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হলেও অতীতে এই খাত জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে এই সাব-সেক্টরের অবদান ছিল সমগ্র দেশজ উৎপাদনের ৫ থেকে ৬ ভাগের মত।[৬] দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা আমলে (১৯৭৮-৮০) জিডিপিতে এই খাতের সরাসরি অবদান ছিল ৫%।[৭] অবশ্য কালক্রমে পশু সম্পদ উপখাতের অবদান যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

সারণী-১ হতে লক্ষ্যনীয় ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষিখাত একক বৃহত্তম খাত হিসেবে স্বীকৃত হলেও এর অন্যান্য উপ-খাত বিশেষ করে পশুসম্পদ উপ-খাতের অবদান যৎসামান্যই। ১৯৯০-৯১ সালে কৃষিতে পশু সম্পদ খাতের অবদান ছিল ৭.২৯ ভাগ কিন্তু সমগ্র দেশজ উৎপাদনে আলোচ্য উপ-খাতটির অবদান ছিল ২.৭ ভাগ মাত্র। একইভাবে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে এই উপ-খাতটির অবদান কৃষিতে ১০.১১ ভাগ ধরা হলেও সমগ্র দেশজ উৎপাদনে এই উপ-খাতের অবদান ধরা হয়েছে

৬। বাংলাদেশ সরকার, *১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা* ১৯৭৩-৭৮ *(ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন,* ১৯৭২*) পৃঃ* ১২
৭। বাংলাদেশ সরকার দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৮- ৮০ (ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৮)পৃঃ ১০৪

৩.২ ভাগ মাত্র। সারণী-২ এ এটা লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর পর্যন্ত এই উপ-খাতটির অবদান ৩.১% এ স্থির হয়ে ছিল। সুতরাং এখান থেকে বলা যায়, সরকার কর্তৃক নানা রকম উন্নয়নমুলক পদক্ষেপ নেবার পরও এই গুরুত্বপূর্ন উপ-খাতটির প্রায় কোন উন্নয়নই হয়নি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কৃষি ও কৃষি উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির দিক দিয়ে পশু সম্পদ উপ-খাত দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবৃদ্ধিশীল উপ-খাত।

- ❑ পশু সম্পদ উপ-খাত সমষ্টিক অর্থনীতিতে আর্থিক অবদান কম রাখলেও পশু সম্পদ ছাড়া দেশীয় কৃষি ব্যবস্থা অচল একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ দেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন বিধায় হাল চাষ ও গাড়ী টানার একমাত্র উপায় হচ্ছে গরু - মহিষ। তাছাড়া পশু সম্পদের বিভিন্ন উপজাত যেমন গোবর ইত্যাদি শস্য অধিকতর ফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- ❑ পশু সম্পদ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানী পণ্যের মধ্যে কৃষি ও কৃষি উপজাত পণ্যের সংখ্যাই বেশী। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে প্রক্রিয়াজাত চামড়া এবং কাঁচা চামড়া রপ্তানী থেকে আয় হয় ১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এই রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪ মিলিয়ন টাকা।[৮] ১৯৯৬-৯৭ সালে পাট ও চামড়া রপ্তানী আয় ছিল মোট রপ্তানী আয়ের ১২ ভাগের মত।[৯] আমিষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো হচ্ছে দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।

  যদিও পশু সম্পদ খাতের উন্নয়ন ধীরগতিতে হবার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় দুধ - মাংসের উৎপাদন খুব বেশী বাড়েনি। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে দুধ ও মাংসের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৩.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৪.৪৭ লক্ষ মেট্রিন টন। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে দুধ ও মাংসের উৎপাদন দাড়ায় যথাক্রমে ১৬.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৫.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন।[১০] বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে পশু সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে গুড়ো দুধের মোট চাহিদার ৬০% যোগান দেয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ There has been a 60 percent fall in the import of milk powder[১১] যার অর্থ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়।

৮। বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেটবুক, বাংলাদেশ-৯৭ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং) পৃঃ ২৬২

৯। বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৮ (ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮) পৃ-৩৫

১০। বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০

১১। বাংলাদেশ সরকার, *ফিফ্‌থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান* - ১৯৯৭-২০০২ (ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) পৃঃ ২৫৩

- ❑ পশু সম্পদ কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এক হিসাবে বলা হয়, সারাদেশে ব্যক্তিগতখাতে ৫০,০০০টি মুরগীর খামার, ২৬,০০০টি হাঁসের খামার এবং ২৬,০০০টি দুগ্ধ খামার আছে।[১২] এই খামারগুলিতে যে কর্ম সংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের মোট শ্রম শক্তির ৬৩ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত। পশুপালন উপ-খাত কৃষি খাতের একটি অন্যতম উপ-খাত হওয়ায় নিঃসন্দেহে পশু সম্পদ কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পশু সম্পদ উপ-খাত

পশু সম্পদ উপ-খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে (১৯৮০-৮৫) অনেক গুলো নীতি ও কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছিল। গৃহীত প্রধান প্রধান নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পশু ও হাঁস-মুরগীর মৃত্যুহার কমানো, প্রজনন ও জৈবিক উৎপাদনের মান উন্নত করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।[১৩] কিন্তু খাতওয়ারী কর্মসূচী গুলো প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে বরাদ্দকৃত সম্পদ পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ করা হয় ১০৭.৩ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র ৫৭.৯৭ কোটি টাকা[১৪] এইজন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে গবাদি পশুর মৃত্যুহার কমানোও সম্ভব হয়নি। জৈবিক উৎপাদন ক্ষমতা, পর্যাপ্ত গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব এর মূল কারণ। এসব কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই ধীর গতিতে। নিম্নের সারণী-৩ এ ১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশু খামারজাত পণ্যের উৎপাদন এবং গড় প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলঃ

সারণী - ৩

১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশু খামারজাত পণ্যের উৎপাদন এবং গড় প্রবৃদ্ধির হার

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭২-১৯৭৮)				দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)		
পণ্য	১৯৭২-৭৩	১৯৭৭-৭৮	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)	১৯৭৯-৮০	১৯৮৪-৮৫	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)
১। দুধ (০০০) টন	৭০৩.৬৫	৭৫২.৮৭	১.৪০	৭৭১.৯০	৮২৫.০০	১.৩৮
২। মাংস (০০০) টন	১৫৯.০০	১২৯.৬০	২.৫	১৮৮.৬২	২১৫.০০	২.৬৯
৩। ডিম (কাটি সংখ্যায়) (০০০) টন	৬৬.০০ ২৬.৪৯	৮৯.৬০ ৩৫.৯৬	৬.৩০ ৬.৩০	১০০.৭০ ৪০.৪৩	১৩৫.০০ ৫৪.১৯	৬.০৪ ৬.০৪
মোট (০০০) টনঃ	৮৮৯.১৪	৯৬৮.৪৩	১.৭৮	১,০০০.৯৫	১,০৯০৪.১৯	১.৮০

উৎসঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) পৃঃ ২০৩।

১২। পূর্বোক্ত

১৩। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ সরকার, *প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫* (ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)

১৪। বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০(ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)পৃঃ ২০৩

সারণী-৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ১.৭৮ ভাগ। এই প্রবৃদ্ধির হার ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১.৮০ ভাগে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে সারাদেশে দুধের উৎপাদন দাড়ায় ৮২৫ টন যা মাথাপিছু প্রায় ০.০২ কিলোগ্রাম বা দৈনিক গাভীপিছু ০.৬৫ কিলোগ্রাম।[১৫] দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার কারণ হিসাবে বলা হয়, দেশী জাতের গরুর দৈহিক গড়ন তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট, পর্যাপ্ত খাদ্য ও সবুজ লতাপাতা জাতীয় পশু খাদ্যের অভাব এবং শুকনো পশুখাদ্যের উচ্চ মূল্য ইত্যাদি। এছাঁড়া গাভী দিয়ে হালচাষ করানোও দেশে দুধের কম উৎপাদনের কারণ হিসাবে বলা হয়। পশুসম্পদ খাতের বিরাজমান স্থবিরতা দুর করে জাতীয় অর্থনীতিতে এই উপ-খাতের অবদান বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ যাতে তৈরী হয় সে জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে (১৯৮৫-৯০) বেশ কিছু কৌশলাদি ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কৌশলাদির মধ্যে ছিল পশু শক্তির উন্নয়ন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি।[১৬] কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পশু খাদ্য ও জাবের গুনগত ও পরিমানগত পরিবর্তন আনয়ন, রোগনিয়ন্ত্রন, কৃত্রিম প্রজননের প্রসার ঘটিয়ে বংশগত উন্নয়ন, জনশক্তি ও গবেষণা এবং লোন সুবিধা ইত্যাদি। এ সময় আনুমানিক হিসেবে দেশে গরু ও মহিষের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩২ লাখ ২০ হাজার, ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ছিল ১ কোটি । ৭ লাখ ২০ হাজার এবং হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার। এ সময় ১.২০ কোটি বা ততোধিক গো-মহিষ চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল।[১৭]

এই পরিকল্পনায় ৫০% পশুকে রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনার কথা বলা হয়। এজন্য ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৩০ কোটি ডোজ। এই পরিকল্পনা আমলে জনশক্তি উন্নয়নের জন্য ৪৪০ জন অফিসার এবং ১০০০ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীকে যথাক্রমে চাকুরীকালীন এবং চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ দেবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এইভাবে ১৮,০০০ কৃষককে উন্নত পশুপালন পদ্ধতি অনুশীলন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য এবং পরিকল্পনা আমলে পশুখাদ্য সরবরাহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে গৃহপালিত পশুসম্পদের উন্নয়নের জন্য ২৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

১৫। বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২
১৬। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূর্বোক্ত
১৭। বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২

সারণী - ৪

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

পণ্য	একক	১৯৮৯ - ৯০		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার%
দুধ	০০০ মিলিয়ন টন	১৩৯৯০.০	১৩২৬.০	৯৫.৩৯
মাংস	০০০ মিলিয়ন টন	৪৮০.০	৪৩৫.০	৯০.৬৩
ডিম	কোটি সংখ্যা	২২০.০	১৯১.০	৮৬.৮২
ভ্যাকসিন	কোটি মাত্রা	৩০.০	২২.০	৭৩.৩৩
কৃত্রিম প্রজনন	লাখ সংখ্যা	৯.০	৮.০	৮৮.৮৯
উন্নত মুরগীর বাচ্চা বিতরণ	লাখ সংখ্যা	১১.০	৩০.০	২৭২.৭২

উৎসঃ ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পৃঃ ভিডিঃ১

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে দুধ, মাংস ও ডিমের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১.৭৭%, ২.৩৮ ও ৬.৩৪ শতাংশ হারে।[১৮] (সারণী - ৪) এই পরিকল্পনা শেষে মাংস উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলের চেয়ে হ্রাস পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে মাংস উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি দাড়িয়েছিল ২.৬৯ শতাংশে। যা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে গিয়ে দাড়ায় ২.৩৮ শতাংশে। এর কারণ হিসেবে বলা হয় পশু মৃত্যুহার লক্ষমাত্রা অনুযায়ী হ্রাস না পাওয়া। সারণী-৪ এ দেখানো হয়েছে যে, পরিকল্পনা আমলে ৫০ ভাগ পশুকে রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনার কথা বলা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভ্যাকসিন উৎপাদিত না হওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি। সারণী-৪ এ দেখানো হয়েছে যে, ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩০ কোটি ডোজ কিন্তু উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ২২ কোটি ডোজ যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৩. ৩৩ ভাগ মাত্র। এ ছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশু সম্পদ উপ-খাতে বিনিয়োগ ২৪৫ কোটি ধরা হলেও প্রকৃত বিনিয়োগ ছিল মাত্র ২০৫.৭৯ কোটি টাকা যার মধ্যে আবার পূনর্বিবেচিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ছিল ১২৬.৭৫ কোটি টাকা।[১৯]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) আমলে পশু সম্পদ উপ-খাতের ধীর উন্নয়নের জন্য পশুচারণ ভূমি শস্য উৎপাদনে ব্যবহারকরণ, উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের জন্য ছোট কান্ড বিশিষ্ট ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে পশু খাদ্যের ঘাটতি এবং জ্বালানী ও গৃহ নির্মান কাজে খড়ের ব্যবহার ইত্যাদিকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে পশুরোগকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে বলা হয় বিভিন্ন রোগে বার্ষিক ১৫% পশু ও হাঁস-মুরগী মারা যায়।[২০]

১৮। বাংলাদেশ সরকার, *ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯০-৯৫ (ঢাকাঃপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)পৃঃ ভিডিঃ১*

১৯। পূর্বোক্ত, V.D-2

২০। পূর্বোক্ত, P.V.D-3

এই পরিকল্পনা আমলে গৃহপালিত পশুর মধ্যে ০.৫৭ মিলিয়ন ছিল মহিষ, ১৩.৫৬ মিলিয়ন ছিল ছাগল, ০.৬৭ মিলিয়ন ছিল ভেড়া, ৬১.০৯ মিলিয়ন ছিল মুরগী এবং ১২.৬২ মিলিয়ন ছিল হাঁস। এ সময় ০.৫% হারে গৃহপালিত পশু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[২১]

এই পরিকল্পনায় পশু সম্পদ উপ-খাতকে গতিশীল করার জন্য যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, বংশগত উন্নয়নের মাধ্যমে পশুর মানগত উন্নয়ন সাধন, পশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি হতে মুক্ত রাখা, প্রান্তিক চাষীস্তর পর্যন্ত পশুপালন উন্নতকরণের মাধ্যমে দুধ এবং দুগ্ধজাত উৎপাদন বাড়ানো, গ্রামীন দরিদ্র কৃষক, নিঃস্ব মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য এই পরিকল্পনা আমলে (১৯৮৯-৯০ সালের মূল্য সূচক হিসেবে) ৫৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।[২২]

সারণী - ৫

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলের লক্ষ্যমাত্রা

পণ্য	ইউনিট	বর্তমান (১৯৮৯-৯০)	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৯৪-৯৫)
দুধ	০০০ টন	১,৩২৬	১,৪৮০
মাংস	০০০ টন	৪৩৫	৫১০
ডিম	কোটি সংখ্যা	১৯১	২৬০
ভ্যাকসিন (উৎপাদন)	মিলিয়ন ডোজ	২২২	৩০০
কৃত্রিম প্রজনন (গরু-মহিষ)	মিলিয়ন সংখ্যা	০.৮০	১.৫০
প্রশিক্ষণ (কৃষক, বেকার যুবক)	হাজার জন	১৩০	১৩০

উৎসঃ ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯০-৯৫

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলের গৃহীত পদক্ষেপ সমুহের ফলে আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সেবা বিতরণ এবং উপকরণ উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এখানে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে পশুজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন এবং একই সঙ্গে চাহিদা দেখানো হল।

২১। পূর্বোক্ত, চ.ঠ.উ-২

২২। পূর্বোক্ত, চ.ঠ.উ-১৪

সারণী - ৬

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশুজাত দ্রব্যসমূহের চাহিদা এবং উৎপাদন

	জনসংখ্যা (মিলিয়ন সংখ্যা)	দুধ (মিলিয়ন টন)		মাংস (মিলিয়ন টন)		ডিম (মিলিয়ন সংখ্যা)	
		চাহিদা	উৎপাদন	চাহিদা	উৎপাদন	চাহিদা	উৎপাদন
১৯৯১	১০৮	৯.৮৬	১.৩৪ (১৩.৫৯%)	৪.২৬	০.৪৫ (১০.৫৬%)	৮৯৮৫.৬০	২০৪৬.৬০ (২২.৭৮%)
১৯৯৫	১২১	১১.০৪	১.৪১ (১২.৭৭%)	৪.৭৭	০.৫১ (১০.৬৯)	১০,০৬৭.২০	২৫৩৯.০ (২৫.২২%)

উৎসঃ ফিফ্‌থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯৭-২০০২, পৃঃ ২৫৩

সারণী-৬ এ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশুজাত দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা এবং সঙ্গে সঙ্গে এগুলির উৎপাদন দেখানো হয়েছে। সারণী-৬ এ দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালে দেশে জনসংখ্যা ছিল ১০৮ মিলিয়ন সে সময় দুধের চাহিদা ছিল ৯.৮৬ মিলিয়ন টন কিন্তু উৎপাদন হয়েছিল এ সময় মাত্র ১.৩৪ মিলিয়ন টন যা ছিল মোট চাহিদার ১৩.৫৯%। ১৯৯৫ সালে এই পরিকল্পনা শেষে জনসংখ্যা দাড়ায় ১২১ মিলিয়ন যখন দুধের চাহিদা ছিল ১১.০৪ মিলিয়ন টন কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১.৪১ মিলিয়ন টন যা ছিল সমগ্র চাহিদার মাত্র ১২.৭৭%। অর্থাৎ এ সময় বার্ষিক দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩ ভাগ। একইভাবে মাংসের উৎপাদনও বেড়েছে তবে খুব সামান্য হারে মাত্র ৩.২ হারে। তবে ডিম উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি সন্তোষজনক। এটা ছিল ৬.৫ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পরিকল্পনা আমলে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাতটির খুব সামান্যই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অথচ কৃষি খাতের অন্যান্য যে কোন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির তুলনায় এই সেক্টরের প্রবৃদ্ধি দ্বিতীয় বৃহত্তম। নিচে Pie Chart-1 এর সাহায্যে ১৯৯৭-৯৮ সালের কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, পশু সম্পদ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৩৬ ভাগ। শুধুমাত্র মৎস্য সম্পদ উপ-খাত এই খাতের চেয়ে বেশী যা সমগ্র কৃষির ৩৮ ভাগ মাত্র। এখান থেকে এটা অনুমান করতে অসুবিধা হয়না যে, এই খাতে প্রচুর অব্যবহারকৃত সম্পদ বর্তমান।

Pie Chart - 1

১৯৯৭-৯৮ সালের কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি (১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যে)

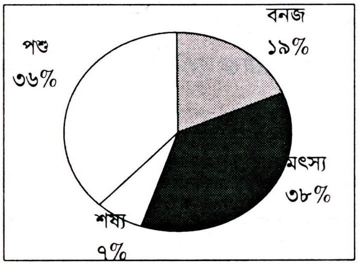

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) এবং পশু সম্পদ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) পশু সম্পদ খাতকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই খাতের উন্নয়নের স্বার্থে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিম্নে এই পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য সমূহ এবং উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনা করা হলো।

উদ্দেশ্যাবলীঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশু সম্পদ খাতে গৃহীত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন

গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, ছাগল প্রভৃতি পালনের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষক ও নিঃস্ব মহিলাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। উদ্যোক্তা শ্রেনীর উন্নয়ন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং টার্গেট গ্রপের উন্নয়ন সাধন। পশু সাধন উন্নয়নের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন দারিদ্র দুরীকরণ।

মানব উন্নয়নের জন্য গবেষণা

বিএলআরআই (বাংলাদেশ লাইভ স্টক রিসার্চ ইন্সটিটিউট) এর মাধ্যমে গবাদি পশুর প্রজনন উন্নয়ন, খাদ্য ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রনের জন্য যুগোপযোগী গবেষণা করা। জেনেটিক উন্নয়ন, যথাযথ পশু চিকিৎসা সুবিধা, পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গৃহপালিত পশু এবং গরু-মহিষের উন্নয়ন ঘটানো।

পশুজাত খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি

পশু খাদ্য উৎপাদন, উন্নয়ন, পশুরোগের নিয়ন্ত্রন করে এবং উন্নত জাতের পশু পালনের মাধ্যমে দুধ, মাংস, হাঁস-মুরগী, ডিম, চামড়া ইত্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে পশুজাত খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। মান সম্পন্ন পশু চামড়া রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমান বৃদ্ধি করা এবং, গুঁড়ো দুধের আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। এছাড়াও টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং এই খাতে যথাযথ গতিশীলতা আনয়নও এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। উপরোক্ত
উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলাদী নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

গবেষণা ও উন্নয়ন

বংশগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় পশুসম্পদে উন্নয়ন ঘটানো। প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিএলআরআই কে শক্তিশালীকরণ যাতে অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য গবেষণা করা হবে।

প্রতিষেধক সরবরাহ

সংক্রামক ও জীবাণুঘটিত পশুরোগের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রতিষেধক টিকার উৎপাদন বাড়ানো। লাইভস্টক সার্ভিস বিভাগের মাধ্যমে ভেটেরিনারী প্রতিষেধক বানিজ্যিকীকরণ।

পশুখাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

প্রাপ্য ভূমির নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমে পশুখাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে জনশক্তির দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো।

উপকরণ সরবরাহ এবং ব্যক্তি পর্যায়ে পশু প্রতিপালন সেবা সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে ছোট ছোট দুগ্ধ খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান, উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি পশু পালনে উৎসাহ প্রদান, ডিম এবং মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য হাঁস-মুরগী পালনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, পশু খামার এবং হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনে বেসরকারী খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, বাজার ব্যবস্থা উন্নতকরণ, যাতে উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন, গুঁড়ো দুধ এবং অন্যান্য পশুজাত দ্রব্যের আমদানী নিরুৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কৌশলাদী গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) পশু সম্পদ উপ-খাত উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশুসম্পদ, উপ-খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ খাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীগুলি হলোঃ

১। **খাদ্য ও জাবের উন্নয়নঃ** অপুষ্টি ও সহজে আক্রমনযোগ্য পশুরোগ পশুশক্তি হ্রাস এবং দুগ্ধখামারজাত পণ্যের নিম্ন উৎপাদনের প্রধান কারণ। পশুখাদ্য উন্নয়নের জন্য সরকার ঋণ ও প্রযুক্তি আকারে সহায়তামূলক সেবা প্রদান করবে। শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে এবং ইপিল-ইপিল প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে জাব সরবরাহের উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকার উৎসাহ যোগাবে।

২। **পশু স্বাস্থ্য এবং রোগ নিয়ন্ত্রনঃ** এই কর্মসূচীগুলির মধ্যে রয়েছে রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা, প্রতিষেধক এবং মেডিসিন উৎপাদন ও বিতরণ। পশুরোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য গুনগত ও পরিমানগত উভয় ধরনের উন্নয়ন সাধন করা হবে।

৩। **পশু প্রজনন এবং প্রজনন বহুমুখীকরণঃ** কৃত্রিম প্রজনন এবং অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশীয় পশু প্রজাতির উন্নয়ন ঘটানো হবে।

৪। **প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাঃ** পশুসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি সারা দেশে প্রচলন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সেবা ব্যপ্তিকরণের মাধ্যমে কৃষক, খামার-মালিক, এনজিও প্রভৃতি সংস্থা সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। ভেটেরিনারী কলেজ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ ও ৩ হতে যথাক্রমে ৬ ও ২১ এ উন্নীত করা হবে যে গুলি ৬টি বিভাগ এবং ২১টি পুরাতন জেলা সদরে স্থাপন করা হবে।

৫। **উপকরণ উৎপাদনঃ** এই পরিকল্পনায় আশা করা হয় যে, পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন উপকরণ যেমন ভ্যাকসিন উৎপাদন, সিমেন, মুরগীর বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা, ডিম ইত্যাদির উৎপাদন, উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাবে। নিচের টেবিলে উপকরণ সমূহের ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রকৃত উৎপাদনের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হলোঃ

সারণী - ৭

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) গৃহীত উপকরণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

উপকরণ	১৯৯৬-৯৭	২০০১-০২
ভ্যাকসিন (মিলিয়ন ডোজ)	৩৫০.০০	৪০০.০০
সিমেন ও উৎপাদন (মিলিয়ন সংখ্যা)	১.৮	৪.৫
মুরগীর বাচ্চা (মিলিয়ন সংখ্যা)	৪.০	৬.০
হাঁসের বাচ্চা (মিলিয়ন সংখ্যা)	০.৫	১.০
শ্রম দিবস (মিলিয়ন দিবস)	১২.৫০	১৬.০০
হাঁস-মুরগীর খামারে কর্মরত শ্রমিক (জন)	২২,৬০০.০০	৪৫,০০০.০০
ছোট মুরগীর লালন-পালনকারী (জন)	৮,০০০.০০	১২,০০০.০০
পশুখাদ্য বিক্রেতা (জন)	১,০০০.০০	৩,০০০.০০
ডিম সংগ্রহকারী (জন)	২,৬০০.০০	৬,৫০০.০০

উৎসঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) থেকে সংগৃহীত

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রাণীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুধ, ডিম এবং মাংসের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, দুধের উৎপাদন প্রায় দিগুন হবে বলে লক্ষ্যমাত্রায় ধরা হয়েছে। একই রকম ভাবে, ডিমের উৎপাদনও প্রায় দ্বিগুন ধরা হয়। সারণী-৮ এ দেখা যায় যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে দুধের বার্ষিক প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১,৫১০ মিলিয়ন টন যা ২০০২ সালে এই পরিকল্পনা শেষে দাড়াবে বার্ষিক ২০৫৮ মিলিয়ন টন। একই ভাবে ডিমের উৎপাদন ১৯৯৬-৯৭ সালে যেখানে ছিল ২৮১৫ মিলিয়ন তা এই পরিকল্পনা শেষে গিয়ে দাঁড়াবে ৪,৭৩০ মিলিয়নে। মাংসের উৎপাদন, যা ছিল

১৯৯৬-৯৭ সালে ৫৭৫ মিলিয়ন টন এই পরিকল্পনা শেষে মাংসের উৎপাদন দাড়াবে বার্ষিক ৭৮৮ মিলিয়ন টন।

সারণী-৮

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

পণ্য	ইউনিট	১৯৯৬-৯৭ বেঞ্চমাক	১৯৯৭ - ২০০২ লক্ষ্যমাত্রা				
			১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২
দুধ	মিলিয়ন টন	১,৫১০	১,৬৮০	১,৭৬৪	১,৮৫০	১,৯৪২	২,০৫৮
মাংস	মিলিয়ন টন	৫৭৫	৬৩০	৬৬২	৭০২	৭৪৪	৭৮৮
ডিম	মিলিয়ন সংখ্যা	২,৮১৫	৩,২৬০	৩,৫৫০	৩,৮৯০	৪,২৮০	৪,৭৩০

উৎসঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) পৃঃ ২৫৬

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৫,৪৩৫.৬০ মিলিয়ন টাকার সরকারী বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। এছাড়াও আশা করা হয়েছে বেসরকারীখাত থেকে এই খাতে আরও ২০,৬৪৬.৪০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ হবে বলে ধরা হয়েছে।[২৩] নিচের সারণী-৯ এ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে বিভিন্ন আর্থিক বছরে কিভাবে সরকারী বিনিয়োগ বন্টন করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

সারণী - ৯

পশুসম্পদ উপ-খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আর্থিক বছরে সরকারী বিনিয়োগ (১৯৯৬-৯৭ এর মূল্য সূচক অনুযায়ী)

বছর	আর্থিক বিনিয়োগ চিত্র
১৯৯৬-৯৭	৬৯০.০০
১৯৯৭-৯৮	১,০০০.০০
১৯৯৮-৯৯	১,০০০.০০
১৯৯৯-২০০০	১,০১২.০০
২০০০-২০০১	১,১৬৪.০০
২০০১-২০০২	১,২৫৯.০০
মোট	**৫,৪৩৫.৬০**

উৎসঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) পৃঃ ২৫৭

২৩। বাংলাদেশ সরকার, *ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯৭-২০০২ (ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭) পৃঃ ২৫৬*

উপসংহার

পশু সম্পদ উপ-খাতের সার্বিক চিত্র বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদিও এই উপ-খাতটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে তারপরেও অতীতে এই উপকারী উপ-খাতকে উপেক্ষা করে অথবা অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে অথবা গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হবার ফলে এই যথেষ্ট প্রবৃদ্ধিময় উপ-খাতটি দেশের অর্থনীতিতে যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। আশা করা যায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হলে এই উপ-খাত গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে সার্বিক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Government of Bangladesh. *Bangladesh Econbomic Survey 1998-89.* Dhaka: Ministry of Finance /Division, 1989.

Government of Bangladesh. *Fifth Five Year Plan 1997-2002.* Dhaka: Ministry of Planning, Planning commissionk. 1998.

Goverment of Bangladesh. *Forth Five Year Plan 1990-1995.* Dhaka: Ministry of Planning, Planning Commission, 1990.

Government of Bangladesh. *Participatory Perspective Plan for Bangladesh 1995-2010* Dhaka: Ministry of Planning, Planning Commission, 1995.

Government of Bangladesh. *Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics Statistics Division, Ministry of Planning, 1998.

Government of Bangladesh. *Statistical Yearbook of Bangladesh.* Various Issues. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics Statistics Division, Ministry of Planning.

Government of Bangladesh. *Study on Urban Poverty in Bangladesh. Final Report Vol. 1. Survey Results.* Dhaka: Ministry of Planning. Asian Development Bank, 1996.

Government of Bangladesh. *The Bangladesh Census of Agricultural and Livestock: 1983-84* Vol. 1, *Structure of Agricultural Holdings and Livestock Population.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1986.

Government of Bangladesh. *Rural Credit Survey in Bangladesh, 1987.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1989.

বাংলাদেশ সরকার। *দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫।

বাংলাদেশ সরকার। *দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৮-৮০।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৮।

বাংলাদেশ সরকার। *তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫।

বাংলাদেশ সরকার। *প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৩।

বাংলাদেশ সরকার। *বাৎসরিক বাজেট ১৯৮৫-৮৬।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫।

বাংলাদেশ সরকার। *বাৎসরিক বাজেট ১৯৮৬-৮৭।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৬।

বাংলাদেশ সরকার। *বাৎসরিক বাজেট ১৯৮৬-৮৭।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, বিভিন্ন সংখ্যা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার

এ,এম,এম, রেজা-ই-রাব্বী*

ভূমিকা

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দুর্নীতি একটি দুষ্ট সামাজিক ব্যাধি। মানব সভ্যতার আদি থেকে অদ্যাবধি এ ব্যাধির প্রকোপ ও প্রসার সমাজে চলে আসছে। প্রাচীন সভ্যতা সমূহ, সামন্ত সমাজ, শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিল্পবোত্তর ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সকল স্তরেই এর গতিবিধি ও ব্যাপ্তি কম নয়। বিভিন্ন যুগে পাক ভারত উপমহাদেশেও এর পত্তন ও প্রসার ঘটে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নিরূপন করতে গেলে দেখা যায় যে, এই ব্যাধির সর্বাধিক প্রবৃদ্ধির ও প্রসার ঘটে উপনিবেশিক শাসন আমলে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে প্রশাসনের সকল স্তর, ধনিক-বণিক শ্রেণীসহ সমাজের সুবিধা ভোগী উচ্চ স্তরে এর প্রসার ঘটে এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

বিভিন্ন যুগে ও সময়ে যে হারে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রসার হয়েছে তার এক ক্ষুদ্রাংশ পরিমাণও সমীক্ষা হয়নি এ সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয়, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপর। তাই এ ব্যাধির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন তথ্য নির্ভর দলিল পাওয়া কষ্টকর। তবে ঐতিহাসিকগণ সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনাকালে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ ও বর্ণনা রেখেছেন তা থেকে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে আগমন ও শক্তি সঞ্চার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও বিভিন্ন পর্যায়ে যে কুট-কৌশল ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল তা পাওয়া যায় তৎকালীন ইতিহাসে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নিরূপণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে। আর তাই পাক-ভারত উপ-মহাদেশের এবং বাংলাদেশের উপর লিখিত গ্রন্থপঞ্জিতে বর্ণিত পুস্তকাদির সর্বাধিক সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কিছু তথ্য উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সংরক্ষিত রেকর্ড ও পরিসংখ্যান থেকে। বিশেষ করে ব্যুরো কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের, তদন্তকার্য পরিচালনা এবং বিচারের জন্য কোর্টে সোপর্দ করার রেকর্ড পত্র হতে। এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও পত্রিকারও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ১০০ জন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকের উপর। সমীক্ষা পত্রে দশটি প্রশ্ন রাখা হয়। এতে দুর্নীতির প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নিরূপণের জন্য প্রয়াস চালানো হয়।

---

* যুগ্ম-সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

প্রশ্নসমূহে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার কারণ, সর্বাধিক দুর্নীতির আমল ও সময়, দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক শ্রেণী, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবণতার কারণ, সরকারী কর্মচারীদের যে শ্রেনী বা পর্যায়ে দুর্নীতির পরিমাণ বেশী, দুর্নীতি বলতে যা বুঝায়, দুর্নীতি প্রসার ও বিস্তার এর কারণ, সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রশ্ন রাখা হয়। এ প্রশ্নগুলির মাধ্যমে দুর্নীতি কি, কিভাবে এ ব্যাধি সমাজে বিস্তার লাভ করে এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিরূপনের প্রয়াস চালানো হয়। উত্তরদাতাগণ সকলেই শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের কিছু ব্যবসায় নিয়োজিত, কিছু কৃষিজীবি, কিছু চাকুরে। তাঁরা দুর্নীতির কারণ ও বিস্তার সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রতিরোধের বিষয়ে অধিকাংশই দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনকে সবচেয়ে বেশী সহায়ক বলে মত প্রকাশ করেন। প্রদত্ত মতামত সমূহের যুক্তিযুক্ত কারণ ও ভিত্তি রয়েছে। প্রদত্ত মতামতের আলোকে সমাজে দুর্নীতি নামক এ ব্যাধির প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

প্রথম অধ্যায়

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির দুষ্ট ব্যাধি ছেয়ে গেছে। এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষিত সচেতন লোক মাত্রই এ বিষয়ে শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ ও সমালোচনা মুখর যদিও এ সত্যটি প্রমাণ ও প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসা লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। দুষ্ট রাহুর গ্রাস থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা ও উদ্যোগ সমাজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রতিকার প্রতিরোধের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না সমাজের কোন স্তরেই। আর তাই এ ব্যাধি গ্রাস করে নিচ্ছে সমাজের সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এমন কোন স্তর বা প্রতিষ্ঠানের নাম করা যাবে না যেখানে দুর্নীতি নেই। বিরাজিত এরূপ পরিস্থিতিতে যারা সৎ ও নৈতিক জীবন যাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা এর যাঁতাকলে গুমরে মরছেন আর ভাবছেন এর শেষ কোথায়।

১.২ দুর্নীতির এই দুষ্ট গ্রহ সমাজ জীবনের সৌরভ আর সমৃদ্ধি কুরে কুরে খেয়ে রক্ত শূন্য করে ছেড়েছে। দুর্নীতির শেকড় গ্রথিত সমাজের অনেক গভীরে। এর চর্চা মানব সভ্যতার মত প্রাচীন। শেকড় উপড়ে সমাজ জীবনে এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা সহজ কাজ নয়। তাই কেবলমাত্র এর আকার, প্রকার, প্রকৃতি ও বিস্তার নিরূপণ করার লক্ষ্যে এ প্রচেষ্টা। এর কিছুটা নিরূপণ করা গেলেও সামাজিভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ দুর্নীতির সংজ্ঞা

২.১ দুর্নীতি দমন বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশ্বের প্রত্যেক দেশই কম বেশী দুর্নীতির সমস্যায় আক্রান্ত। তবে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এ সমস্যায় বেশী জর্জরিত। দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা লাভবান হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজ ও অর্থনীতির উপর এর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই সার্বিক বিচারে দুর্নীতি সব সময়ই নেতিবাচক। সম্পদ পাচার, নিয়ম বর্হিভূতভাবে সম্পদ অর্জন, ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং দারিদ্রের কারণে দুর্নীতি, সরকারী আমলা মহলের ঘুষ গ্রহণ, অসাধু ব্যবসায়ী মহলের চোরাকারবার, কালোবাজারী, মজুতদারী, শিল্পপতিদের শিল্পের নামে অবৈধ ঋণ গ্রহণ ও ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রসার ঘটায়।

২.২ দুর্নীতির কোন সাধারণ বা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। এর কারণ হল কিছু অপরাধ সকল দেশেই দুর্নীতি বলে চিহ্নিত হলেও বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি প্রতিরোধকারী সংস্থাগুলোর তালিকাভুক্ত অপরাধের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব অপরাধের তালিকার ভিত্তিতে দুর্নীতির বিষয়টি অনুধাবন করে থাকে।

২.৩ সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে আমরা নীতি বা আইন বিরূদ্ধ কাজকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সকল আইন বিরূদ্ধ কাজকেই দুর্নীতি বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কেননা, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের আইন বিরূদ্ধ সকল অপরাধেরই অনুসন্ধান বা তদন্ত করে না। দুর্নীতি দমন ব্যুরো যে সমস্ত অপরাধের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমকে পরিচালিত করে থাকে। নীচে দুর্নীতির একটি সাধারণ সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করা হলঃ

ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে যদি কোন পক্ষ শুধু তার একক অথবা তার এবং অপর পক্ষের, পক্ষসমূহের যৌথ আর্থিক এবং অথবা বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্যে অন্য কোন পক্ষের পক্ষসমূহের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে আইন পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হলে তাহলে ঐ কাজকে দুর্নীতি বলে অভিহিত করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতির বিস্তার

৩.১ মানব সভ্যতায় কবে, কোথায় এবং কার মাধ্যমে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে তা একটি গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলার মত কোন দালিলিক প্রমাণ

নেই। তবে ধারণা করা যায় যে দুর্নীতি কোন সাম্প্রতিক বিষয় নয়। যদিও এই মুহুর্তে ব্যাপকতার কারণে বিষয়টি বহুলালোচিত।

৩.২ ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে সাধারণতঃ গণসমর্থনহীন শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের সময় এবং পরে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর সাথে দুর্নীতির মাধ্যমে হাত মিলিয়ে থাকে। এই ধরণের দুর্নীতিকে আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দূর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অবিভক্ত ভারতের ইতিহাসে এই ধরণের দুর্নীতির সবচেয়ে বেশী প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ইংরেজ কোম্পানী তাদের এদেশীয় দোসরদের সাথে দুর্নীতির মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। 'আওরঙ্গজেবের আমল থেকেই ইংরেজ বণিকদের দুস্কৃতি এমনভাবে চলে আসছিল যে নবাবের পক্ষে সন্দিগ্ধ ও রুষ্ট হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। নবাবের রাজস্ব যাতে হ্রাস পায় এবং বিদেশীর অর্থলাভ বাড়ে তাই কোম্পানী বহু ব্যক্তিকে অসঙ্গতভাবে 'দস্তক' ব্যবহার করতে দিত, শুল্ক না দিয়ে ব্যবসা করার সুবিধার এই অপব্যবহারে ইংরেজগণ অভ্যস্ত ছিল।'[১]

৩.৩ মুর্শিদাবাদে তখন সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র বেশ অগ্রসর হয়ে চলেছিল। আলীবর্দীর প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ছিলেন এই চক্রের একজন নায়ক। মসনদ সম্বন্ধে প্রথম থেকেই তাঁর লোভ ছিল। আর সিরাজও ঈর্শান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিত্তজয় করার ক্ষমতা রাখতেন না। মীর জাফর মুর্শিদাবাদে ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটসনের মারফত ক্লাইভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সেনাপতি রায়দুর্লভ, পদস্থ রাজপুরুষদের মধ্যে ইয়ার লতিফ খান, অর্থের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষমতা বিসর্জনে প্রস্তুত, জগৎশেঠের মতো ব্যক্তিকে চক্রান্তে যোগ দিতে দেখা গেল। আগে থেকে নিজেদের ভাগ স্থির করার জন্য এই কুচক্রীদল দল ১০ই জুন তারিখে এক চুক্তিপত্র খাড়া করেছিল।

কুখ্যাত উর্মিচাঁদ শেঠ লুটের মোটা ভাগ দাবি করে বসায় কুটকৌশলী ক্লাইভ 'শঠে শঠ্যাং' নীতিবাক্য অনুসরণ করে এক জাল চুক্তি খাড়া করে, অনিচ্ছুক ওয়াটসনের দস্তখত জাল করে উর্মিচাদকে ঠকাবার বন্দোবস্ত করলেন। নকল চুক্তিতে বলা হল যে উর্মিচাদ মোটা টাকা পাবে, অথচ আসল চুক্তিতে তার কোন উল্লেখ রইল না। ক্লাইভ পরে অনবরত বলতেন যে, বদমাস উর্মিচাদকে জব্দ করতে দুর্নীতির পথে যাওয়াই হল নীতিসঙ্গত।

১। হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ভারবর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ২৭৪

অবশ্য স্বয়ং ক্লাইভ এবং অন্যান্য জাঁদরেল ইংরেজরা নিজেদের পকেটে বাংলার ধনদৌলত লুটে নিয়ে যাওয়ার যে বন্দোবস্ত করলেন তা দেখে বদমাস যে কারা, তা বুঝতে দেরি হয়নি। স্বদেশী ও বিদেশী বদমাসদের দল একত্রিত হয়ে দেশদ্রোহিতা এবং চারিত্রিক অধঃপতনের জঘন্য দৃষ্টান্ত তখন উপস্থাপিত করেছিল।[২]

৩.৪ দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাব সিরাজদৌলাকে মসনদ থেকে হটানোর পর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি ও লুটপাট শুরু হয়ে যায়। মীর জাফরকে মসনদে বসিয়ে ক্লাইভ পুরস্কার পেলেন ২,৩৪,০০০ পাউন্ড। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয়রা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউন্ড। ক্লাইভ দলিলদস্তাবেজ জাল করিয়ে এমন ব্যবস্থা করলেন যে উর্মিচাদের ভাগ্যে কিছুই জুটল না। ৮৮০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে চব্বিশ পরগনার জমিদারী কোম্পানীর হাতে গেল, বৎসরে এখান থেকে মোটামুটি দেড় লক্ষ পাউন্ড খাজনা আদায় হত। এই চব্বিশ পরগনা পরে ক্লাইভকে জায়গীর হিসেবে দেয়া হয়। তোশাখানা প্রায় শূন্য হয়ে পড়ায় নবাব ক্লাইভকে অনুনয় করে কয়েকটি শর্তে রাজী করান, স্থির হল যে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের ভূমিরাজস্ব থেকে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা পাবেন, সাড়ে দশ লক্ষ পাবেন বর্ধমান, কৃষ্ণনগর আর হুগলী থেকে আর তারপর বৎসরে ঊনিশ লক্ষ টাকার জন্য ঐ তিনটি জেলা বন্ধক হয়ে থাকবে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে কোম্পানী চাকুরীয়াদের বেতন অত্যন্ত অল্প দিত বলে তারা উপঢৌকন নিতে অভ্যস্ত ছিল, আর উপঢৌকন গ্রহণে কোন নিষেধও ছিল না। পলাশীর পর অর্থ লাভের ব্যাপারে মাত্রা জ্ঞান আর রইল না। কামধেনুকে দোহন করার এক উম্মাদ আবেগ যেন তখন এসে গিয়েছিল, কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে সর্বস্তরে তখন নিছক নিজেদের স্বার্থে যথাসম্ভব দ্রুত বিপুল সমৃদ্ধি সংগহের কামনা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। কিছুকাল পরে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রীরঙ্গপত্তমের লুণ্ঠন থেকে লর্ড ওয়েলেসলিকে উপযাচক হয়ে এক লক্ষ পাউন্ড উপহার দিতে গেলে তিনি নাকি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। ওয়েলেসলির দৃষ্টান্তকে ব্যতিক্রম বলা চলেঃ ক্লাইভের আমলে কোম্পানীর ইংরেজ চাকুরিয়ারা সকলে মিলে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে একেবারে নির্লজ্জভাবে প্রবৃত্ত হয়েছিল।[৩]

৩.৫ মীরজাফরের পরিবর্তে তার জামাতা মীর কাশেমকে মসনদে বসানো হয়। কিন্তু দুর্নীতি এবং লুটপাট আগের মতই চলতে থাকে। কোম্পানীর দাবি-দাওয়া মিটিয়ে বর্ধমান মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দিয়ে ভ্যান্সিটাটকে ৫০,০০০ পাউন্ড হলওয়েলকে ২৭,০০০ পাউন্ড এবং কাউন্সিলের অপর সদস্যদের প্রত্যেককে দশ থেকে পঁচিশ হাজার পাউন্ড ঘুষ দিয়ে মীর কাশেম যেন 'পাপ চুকিয়ে' শাসন কার্যে মনোযোগ দিলেন।[৪]

২। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়,ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬
৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়,ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬
৪। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়,ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬

৩.৬ ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশেমের ঝগড়া বাধতে দেরী হল না। আর স্বভাবতই ঝগড়া বাধল বাণিজ্য নিয়ে। ইংরেজ কোম্পানী বিনা শুল্কে আমদানী ও রপ্তানীর অধিকার পেয়েছিল। এরই কদর্থ করে কোম্পানী কর্মচারীরা নবাবের অনুমতি পেয়ে দস্তক নামে ছাড়পত্রের প্রচন্ড অপব্যবহার আরম্ভ করল। দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে যে শুল্ক দেয় তা এড়াবার জন্য খুশীমত যে কোন পণ্যদ্রব্যকে দস্তকের জোরে বিনা শুল্কে স্থান থেকে স্থানান্তরে পাঠানো হতে লাগল; ইংরেজ কোম্পানী এবং তার কর্মচারী ও আশ্রিতের দল এই দস্তক ভাঙ্গিয়ে মোটা লাভ করতে লাগল। সরকারের রাজস্ব নষ্ট হল। এ দেশের ব্যবসায়ীরা শুল্ক দিতে বাধ্য হওয়ায় প্রতিযোগীতায় কোম্পানী এবং তার অনুচরদের কাছে মার খেল। লাভ হল কোম্পানীর আর তার অনুগতদের অথচ লোকসান হল সরকারের এবং প্রায় সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের।[৫]

৩.৭ মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী, কোম্পানীর দুর্নীতি, জালিয়াতী ও ক্ষমতার অপব্যবহারের এক জলন্ত নজির। ১৭৭৫ সালে মহারাজ নন্দকুমার নামে নবাবী আমলের এক প্রখ্যাত ব্রাক্ষণ কর্মচারী অভিযোগ করেন যে হেষ্টিংস মীর জাফরের বিধবা পত্নী মনি বেগমকে নাবালক নবাবের অভিভাবিকা হিসেবে মানোনয়নের মূল্য হিসেবে প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করেন। কাউন্সিলের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যগণ হেষ্টিংসকে দোসী সাব্যস্ত করে তাকে ঐ অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। হেষ্টিংস নন্দকুমার এর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেন যে তিনি কামালউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনতে প্ররোচিত করেছেন। এ বিষয়ে যখন তদন্ত চলছিল তখন মোহন প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দ কুমার এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনেন। সুপ্রীম কোর্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড দেয়। একজন বিশেষজ্ঞ এ প্রাণদন্ডকে বিচারের নামে হত্যা (Judicial Murder) হিসাবে অবিহিত করেন। নন্দকুমার এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। বিচারকগণ বিশেষত হেষ্টিংস এর বন্ধু স্যার এলিজা ইম্পে, নন্দকুমার এর প্রতি বিরুপ ছিলেন। ইংল্যান্ডে যে আইনে জালিয়াতির জন্য প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা ছিল তা ভারতবর্ষের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানরত অবস্থায় নন্দকুমার এর ফাঁসী হয়। কোম্পানী আমলে সরকারের সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের এটা ছিল নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।[৬]

৩.৮ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার এদেশীয় দোসরদের মাধ্যমেই মূলতঃ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় পর্যায়েই অখন্ড ভারতে দুর্নীতির ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী ভূস্বামী জমিদার শ্রেণী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর। এর প্রাতিষ্ঠানিক

৫। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যয়,ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬
৬। ভারতের ইতিহাস। ডঃ অনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা - ৭৩

রূপ দেওয়া হয় প্রথম পর্যায়ে পাঁচশালা/দশশালা এবং পরবর্তীতে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড সরকার কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনের দায়িত্ব নিয়ে নেয়া সত্বেও দুর্নীতি ও সম্পদ পাচার থেমে থাকেনি। বলা বাহুল্য যে সম্পদ পাচার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির সর্ব্বোচ্চ রূপ লাভ করে।

৩.৯ প্রায় দুইশত বছর ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে, ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। লোকবলের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা থাকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবৈধ সম্পদ পাচারের ঘটনা শুরু হয়।

৩.১০ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধানের মাত্রা ছিল খুব কম। কিন্তু পরবর্তী সরকারী নীতির ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের এক পাহাড় গড়ে উঠে। ১৯৫৯-৬০ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২ ভাগ এবং ১৯৬৯-৭০ সনে এই পরিমাণ হয় শতকরা ৬১ ভাগ। এইভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের স্থানান্তর ঘটে। পরিকল্পনা কমিশনের এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সন হতে ১৯৬৯-৭০ সন পর্যন্ত সরকারী পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে হস্তান্তর হয়েছে আনুমানিক ৩,১১২ কোটি টাকার সম্পদ (প্রতি বছরে ১৫৫৬ কোটি টাকার মত)।[৭] বেসরকারীভাবে সম্পদ পাচার হয়েছে আরো কয়েকগুণ বেশী। আর তা করে সে আমলের ২২ পরিবার।

৩.১১ এইভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদ পাচারের ঘটনার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যাযেও দুর্নীতির সুত্রপাত ঘটে। এর জন্য দুটো কারণকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। এর প্রথমটি হল সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক "মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯" (Basic Democracies Order, 1959) এই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সমগ্র দেশে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ভোটে জেনারেল আইয়ুব জাতির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।[৮]

৩.১২ দ্বিতীয় কারণটি হল ১৯৫৮ সাল থেকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের শুরু। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী সরকারী অর্থ আত্মসাতের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

৭। এমাজ উদ্দিন আহম্মদ, পৌরবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ অক্টোবর, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা- ৮৭-৮৮

৮। ডঃ মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৮৩৬

এর ধারাবাহিকতায় আজও এ দেশের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত ব্যাপক দুর্নীতি ঘটছে।

৩.১৩ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলন পাকিস্তানী শাসকদের অনমনীয় মনোভাব ও অত্যাচারের কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে রুপান্তরিত হয় এবং অবশেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। বাংলাদেশের অভ্যূদয় ছিল অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দুর্নীতি নির্মুল না হয়ে বরং সমাজের বহু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতাউত্তরকালে নিম্নলিখিত ঘটনা সমূহ এই দুর্নীতি বিস্তারের মূল কারণ।

প্রথমতঃ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশে স্বল্প পরিমাণ যে বৈদেশিক সাহায্য আসে তা কিছু স্বার্থান্বেসী ব্যক্তি হস্তগত করে। এর সাথে যোগ হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুদদারী ও কালোবাজারী। দেশ পুনর্গঠনের এ পর্যায়ে সরকারের পক্ষে নানা কারণে এ দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলস্বরূপ দুর্নীতিবাজ ব্যাক্তিরা ক্ষমতাবান হয়ে উঠে এবং ব্যাপক দুর্নীতি বিস্তারে সক্রিয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ বৃহৎ বেসরকারী বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বিচার রাষ্ট্রীয়করণ এবং আমদানী-রপ্তানীর সিংহভাগ সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং পারমিট প্রদানের মাধ্যমে পরিচালিতকরণ। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এ সময় যোগ্য নির্বাহীর অভাব প্রকল আকার ধারণ করে। সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একটি অংশ দেশসেবার সুযোগ প্রাপ্তিকে সদ্ব্যবহার না করে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর্থিক ক্ষতির কারণ বিশ্লেষণ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দুর্নীতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ যথাযথ শিল্পনীতি গ্রহণ না করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত আমদানী নির্ভর হয়ে পড়ে। এর চাপ পড়ে স্থানীয় মুদ্রার উপর। টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন সকল প্রকার দ্রব্যাদির দামকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে। সে তুলনায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি না ঘটায় প্রকৃত মজুরী ধীরে ধীরে কমতে থাকে। জীবন যাত্রার ন্যূনতম মানকে বজায় রাখতে গিয়ে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি বড় অংশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

চতুর্থতঃ সার্বিক নেতিবাচক অবস্থার সুযোগে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সামরিক শাসকদের রাজনীতি করার অভিলাষ এবং তাদের ব্যাপক জনসমর্থন না থাকায় তাদের আশেপাশে সুবিধাবাদীদের ভিড় জমে উঠে। এ সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি আরো বিস্তার লাভ করে। ক্ষমতাকে সুসংহত করতে গিয়ে সামরিক শাসকগণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর চেয়ে রাজনৈতিক বিষয় বেশী গুরুত্ব প্রদান করে। যথাযথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার ফলে স্থানীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে গুরুত্বহীন পর্যায়ে নেমে আসে। ফলে দেশ চালাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চাহিদা মেটাতে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ থেকে অনুকূলে সাড়া পাওয়া গেলেও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এর একটি অংশ চলে যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, সরকারী কর্মচারীদের নিকট, বাকী অংশ যায় সুবিধাবাদী একটি গোষ্ঠীর পকেটে।

পঞ্চমতঃ দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সৃষ্টি করা হলেও দুর্নীতি বিস্তারের সাথে তাল রেখে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ না করার ফলে ব্যুরো তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়। বড় বড় দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা দুর্নীতি করে সহজে পার পেয়ে যাওয়ার সংযোগ থাকার কারণে দুর্নীতির বিস্তার রোধ করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ষষ্ঠতঃ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সাথে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিমাণ বাড়তে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটার পূর্বে প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই সমস্ত প্রকল্পে দুর্নীতি একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ দুর্নীতির প্রকৃতি

৪.১ দুর্নীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার পূর্বে দুর্নীতির প্রকারভেদ আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করলেই দুর্নীতির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। দুর্নীতির প্রকারভেদ দু'ভাবে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে দুর্নীতি ঘটেছে তাদের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়তঃ যে সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঘটেছে সেগুলোর ভিত্তিতে।

৪.২ প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দুর্নীতিকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ক) ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতিঃ সরকারের কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দুর্নীতি ঘটানো যে একটি পুরাতন বিষয় তা আমাদের এ আলোচনার প্রথম দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকার

কারণে এদের পক্ষে ইচ্ছা করলে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ সাধ্য ব্যাপার। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে দেশে এ ধরণের বেশ কিছু দুর্নীতির তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় দুই সাবেক প্রেসিডেন্ট রো তায়েউ ও চুন ডু হোয়ান, ভারতের প্রাক্তন মন্ত্রি নরসিমা রাও ও কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী, পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেনজীর ভূট্টোর স্বামী আসিফ আলী জারদারীসহ জাপানের বেশ কয়েক জন সাবেক প্রধান মন্ত্রী, ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্কোস এবং বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদও অন্যান্য আরো অনেকের সাথে এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত। খ) সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতিঃ সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকার কারণে এরা দুর্নীতি করার মত অবস্থানে থাকে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এদের মাধ্যমে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। মূলতঃ এই গ্রুপের দুর্নীতির পরিমাণ ও সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, বিশেষ করে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। তবে এ ধরণের দুর্নীতির সাথে কেবল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নয় অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিমহল জড়িত থাকে। গ) বেসরকারী দুর্নীতিঃ যে সকল দুর্নীতিতে শুধুমাত্র বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে তাকে বেসরকারী দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করা যায়। এ ধরণের দুর্নীতির বেশীর ভাগই জমি-জমার মালিকানা সংক্রান্ত বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত। সমাজ বা অর্থনীতির উপর এ ধরণের দুর্নীতির প্রভাব পূর্বে উল্লেখিত দুর্নীতির চেয়ে অনেক কম। চোরাকারবারী, মজুতদারী ও কালোবাজারী এ পর্যায়ভুক্ত দুর্নীতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির উপর এর প্রভাব প্রকট।

৪.৩ নিম্নলিখিত বিষয়ে সরকার ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঘটে থাকেঃ

ক) প্রকল্পে দুর্নীতিঃ সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তার নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। যে কোন প্রকল্পের প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত অনেকগুলো পর্যায় থাকে। একটি প্রকল্প প্রণয়ন থেকে গৃহীত হওয়া পর্যন্ত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রি পরিষদ ও জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) এর ভূমিকা থাকে। প্রকল্পের এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়সমূহ বা কমিটির যে কোন কর্মকর্তা, সদস্য অথবা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রাক্কলন তেরীর সময় কারচুপির মাধ্যমে অতিরিক্ত খরচ দেখানো বা নির্দিষ্ট কাউকে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্য শর্তাবলী শিথিলকরণের মত দুর্নীতির ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

একটি প্রকল্প গৃহীত হওয়ার পরে তার বাস্তবায়নের প্রসঙ্গটি চলে আসে। বাস্তবায়নের পূর্বে ঠিকাদার নিয়োগের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহবান করা হয়। কার্যাদেশ

প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দুর্নীতি ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ না প্রদান করে পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে তাকে বা তাদেরকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়ে থাকে। ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে কখনো কখনো দুর্নীতির উদ্দেশ্যে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা অথবা স্বল্প প্রচারিত বা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে দুর্নীতির মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার সকল কপি ক্রয় করা হয়ে থাকে। এর ফলে পূর্ব নির্ধারিত ঠিকাদার ব্যতীত আগ্রহী অন্যান্য ঠিকাদাররা ঐ দরপত্র বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে না জানায় দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এতে করে পূর্ব নির্ধারিত ঠিকাদেরকে কাজ প্রদান করা সহজতর হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যে সকল দুর্নীতি অনেক সময় ঘটে থাকে সেগুলো হচ্ছে শর্তে উল্লেখিত মানসম্পন্ন মালামালের চেয়ে নিম্নমানের মাল ব্যবহার করা, সরবরাহকৃত মালামাল চুরি করা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক আংশিক বা পূর্ণ বিল পাশ ও প্রদানের সময় উৎকোচ গ্রহণ, কাজের নির্ধারিত মানকে বজায় না রাখা ইত্যাদি।

খ) সরকারী রাজস্ব আদায়ে দুর্নীতিঃ সরকারী ব্যয় নির্বাহের দুটি উপায় থাকে। একটি অভ্যন্তরীণভাবে রাজস্ব আদায় এবং অপরটি বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থাসমূহ থেকে ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করা। প্রথমটি জনসাধারণের উপর ধার্যকৃত কর, এবং নানা রকম সরকারী ফি। করের বৃহত্তম অংশ আসে পরোক্ষ কর যথা আমদানী শুল্ক, আবগারী, ভ্যাট ইত্যাদির মাধ্যমে। ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পণ্য আমদানী, ঘোষিত মানের চেয়ে উন্নতর পণ্য আমদানী, এক পণ্যের স্থানে অন্য পণ্য আমদানী, ইত্যাদি নানাভাবে দুর্নীতি করা হয়ে থাকে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে কম বিক্রয় বা মূল্য সংযোজন দেখিয়ে কর ফাঁকি দেয়া হয়ে থাকে। এ সকল দুর্নীতির সাথে কর বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা থাকে। সরকারী রাজস্বের সিংহভাগ যেহেতু এই করারোপের মাধ্যমে এসে থাকে এ কারণে কর ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও সহজ করার প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে তেমন কর ফাঁকি দেয়াকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আধুনিক যুগোপযোগী করে এই ব্যবস্থাকে গড়ে তুলার প্রয়োজন রয়েছে।

গ) সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিঃ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের আর্থিক লেনদেন এর দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সরকারী বেসরকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে তালিকাভূক্ত প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইউনিটের কার্যক্রম নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা এ উদ্দেশ্যে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রেই

যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিষয় চেপে যান। পরবর্তীতে দুর্নীতি মহীরুহে পরিণত হলে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদেরকে ঋণের একটি নির্দিষ্ট ভাগ ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারী, সিবিএ নেতাদেরকে উৎকোচ প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। এ কারণে ঋণ গ্রহীতার ঋণের খরচ বেড়ে যায়। নানা কারণে ব্যবসা বাধাগ্রস্ত হলে এই ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা ব্যবসার নেট মূল্য - এর চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যায় এবং ঋণ আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতা উৎকোচ প্রদান করে এই মনোভাব পোষণ করেন যে যেহেতু উৎকোচ প্রদান করেন সেহেতু ঋণ পরিশোধ করার আর প্রয়োজন হবে না। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেও বড় বড় ঋণ গ্রহীতার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধ করে না। কাগজে কলমে ঋণের যথাযথ ব্যবহার দেখানো হলেও অনেক ক্ষেত্রে অন্য কাজে এ টাকার ব্যবহার ঘটে। নিয়মানুযায়ী পর্যাপ্ত জামানত না নেওয়া অথবা কারচুপির মাধ্যমে জামনতের মূল্য প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দেখানোর মত দুর্নীতিও ঘটে থাকে। অন্যদিকে কাংখিত ঋণ প্রাপ্তির আশায় ঋণগ্রহীতারা ব্যবসায় প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ না করে মিথ্যা ও অতিরিক্ত ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। বেসরকারী ব্যাংকগুলোর আশ্রয় গ্রহণ করে ঋণ নিয়ে থাকেন। ওভার ইনভয়েসিং, আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাচার, সরকারী রাজস্ব ফাঁকি এবং হুন্ডি ব্যবসার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার দেশে আগমনকে বাধাদান করা হয়। এই ধরণের দুর্নীতি দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। সর্বশেষ শেয়ার বাজারের দুর্নীতি এক সর্বনাশী রুপ ধারণ করেছে। প্রতিদিনের পত্র পত্রিকায় এ একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে।

ঘ) সরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোয় দুর্নীতিঃ সরকারী সেবামূলক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি। দেশে টেলিফোনের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় টেলিফোন সংযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকে হয়রানি এড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীরা অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হন। অপেক্ষমান তালিকা সামনে থাকা ব্যক্তিদের টেলিফোন সংযোগ না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাধ্যমে পেছনে নাম থাকা ব্যক্তিদেরকে সংযোগ দেয়া হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল করে গ্রাহকদেরকে ঘুষ প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীরা বাধ্য হন। অতিরিক্ত বিলের বিরুদ্ধে আপীল করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায় না।

সিস্টেম লসের নামে বিদ্যুৎ চুরি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের সবচেয়ে বড় ধরনের দুর্নীতি। এছাড়া নতুন সংযোগ প্রদানের সময় অতিরিক্ত অর্থ

দাবী করা, ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে মিটার রিডিং কমিয়ে দেয়া, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা, বোর্ডে মালামাল চুরি করে বেশী দামে বাইরে বিক্রি করা, বোর্ডের অনেক কর্মকর্তা, কর্মচারীর জন্য সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারগণ কর্তৃক বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব অবহেলা করে প্রাইভেট প্রাকটিস চালানো, হাসপাতাল কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক হাসপাতালের ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী চুরি ও আত্মসাৎ করা, পছন্দসই প্যাথলজিক্যাল ও অন্যান্য ল্যাবরেটী থেকে চিকিৎসাধীন রোগীদের প্রয়োজনে অথবা বিনা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের টেস্ট করতে বাধ্য করে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরী থেকে নির্দিষ্ট পারসেনটেজ প্রাপ্তির মত দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকেন।

ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিঃ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার একটি পদক্ষেপ হিসেবে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং কিছু শিক্ষক, যোগসাজশের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত চাল-গমের চেয়ে কম পরিমাণ সরবরাহ করে বাকী অংশ আত্মসাৎ করেন। এ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রেও অনেক সময়ই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা, ভর্তি পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা, অধিক অর্থ প্রাপ্তির বিনিময়ে অনিয়মিত ছাত্র ছাত্রীদের নিয়মিত দেখিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত ছাত্রী বৃত্তিতে নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রী সংখ্যা অধিক দেখিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। শ্রেণী শিক্ষকগণ শ্রেণী কক্ষে পাঠদান না করে প্রাইভেট পড়ানোর মাধ্যমে অধিক আয়ের পথ বেছে নেন। শিক্ষাঙ্গনের এই অরাজক অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও মুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকগণ শিক্ষকতা বাদ দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের কনসালটেন্সী কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত করেন।

চ) কাজের বিনিময়ে খাদ্যঃ বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত গমের মাধ্যমে এ কাজ করা হয়ে থাকে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে এ কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে এ সকল প্রকল্পে অনিয়ম, আত্মসাৎ ও দুর্নীতি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। প্রকল্পে বরাদ্দ প্রাপ্তিতে ঘুষ দিতে হয়। গম উত্তোলনে খাদ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয়। আনা নেওয়ার ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে আরো অনেককেই ভাগ/ঘুষ দিতে হয় বলে নির্ধারিত কাজ হয় না। আর এ সুযোগে প্রকল্পে নিয়োজিত তদারকী কর্মকর্তা ও প্রকল্প কমিটিও আত্মসাৎ এর সুযোগ পায়। ব্যুরোতে

প্রাপ্ত অভিযোগ এবং মামলার সংখ্যার সিংহভাগ খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচি দখল করে আছে।

ছ) ভূমি জরীপ ও ভূমি প্রশাসনে দুর্নীতিঃ ব্যক্তি মালিকানায় ভূমি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মালিকের মালিকানা সংরক্ষণ ও নিশ্চিয়তা বিধান সরকারের দায়িত্ব। তহশিলদারের ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ করা এবং ভূমি রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব। সহকারী কমিশনার রেকর্ড সংরক্ষণ ও রাজস্ব আদায়ে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি নিশ্চত করেন। জরিপকালে জরিপ বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ মালিকানা নিরুপনান্তে জরিপ পূর্বক হাল নাগাদ মালিকানা নির্ধারণ করেন। এ সমুদয় কাজই যথা নিয়মে পালন করা নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব। বর্তমানে খাজনা প্রদান, জমা খারিজ করানো, জরিপে ভূমি রেকর্ড করানো ইত্যাদি সকল কাজে ঘুষ না দিলে কোন কাজই হয় না বলে জনমত রয়েছে।

জ) পুলিশ প্রশাসনে দুর্নীতিঃ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন পুলিশের দায়িত্বের অন্যতম স্তম্ভ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাধীদের আইন আমলে এনে বিচারের নিমিত্ত কোর্টে সোপর্দ করা পুলিশের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে থানাই, আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু। যে কোন অপরাধের প্রাপ্ত তথ্যই পুলিশ বাহিনীকে, অপরাধীকে আইন আমলে আনার জন্য তৎক্ষণিকভাবে তৎপর করে। কিন্তু বাস্তবে কোন ফরিয়াদী/অভিযোগকারী থানায় ফরিয়াদ/অভিযোগ জানাতে গেলে কিছু না দিলে তার অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না। অপর পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে আইন/শাস্তি এড়িয়ে যায় এ প্রকার জনমত রয়েছে। বিনিময় ও ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধী কোর্ট হতেও বের হয়ে আসে বা খালাস পায়।

ঝ) যে প্রকার বা প্রকৃতিতে সরকারী কর্মকর্তা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগতভাবে লাভবান হয় অথবা অন্যকে লাভবান হতে সাহায্য করে তাকে দুর্নীতি বলে যা দুর্নীতির সংজ্ঞায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে সরকারী কর্মকর্তা পর্যায়ে দুর্নীতির প্রকৃতি ও প্রকার উল্লেখ করা গেল।

ঘুষ বা উৎকোচঃ সরকারী কাজ আদায়ের জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি নগদ টাকা প্রদান বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদানকে ঘুষ বা উৎকোচ বুঝায়। বৈধ কাজ তরান্বিত করার জন্য যেমন ঘুষ দিতে হয় তেমনি অবৈধ কাজও ঘুষ দানের মাধ্যমে করিয়ে নেওয়া হয়। ঘুষ না দিলে কাজ পাওয়া যায় না, বিল পাশ হয় না। বড় কাজের জন্য বড় অংকের ঘুষ বা উৎকোচ দিতে হয়। আদেশ প্রাপ্তির জন্য ফাইল বা নথি নিচে হতে উপরে আবার উপর হতে নিচে উঠানামা করে। টাকা পয়সা ছাড়া উঠানামা হয় না। ঘুষ বা উৎকোচ দিলে দ্রুত নথি উঠানামা করে অনুকূলে সিদ্ধান্ত

পাওয়া যায়। ভারতের শান্তারাম কমিটি (১৯৬২) একে "স্পীড মানি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

স্বজনপ্রীতি বা নেপোটিজমঃ সরকারী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অথবা অন্যের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আত্মীয়-স্বজনদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া স্বজনপ্রীতি নামক দুর্নীতি ভুক্ত। সজ্ঞানে বা না জেনে অনেক সরকারী কর্মচারী এ দুর্নীতির সাথে জড়িত। অন্যের বেলায় একে অন্যায় মনে করা হলেও নিজের বেলায় এর যৌক্তিকতা খুঁজে বের করা হয়। নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে একে আর দুর্নীতি বলে সাধারণত বিবেচনা করা হয় না।

প্রিয়তোষণ বা ফেভারেটিজমঃ সরকারী সুযোগ নিয়ে অনেক সরকারী কর্মকর্তা নিজের দপ্তরে এবং দপ্তরের বাইরেও প্রিয়তোষণকে অপেক্ষাকৃত বেশী অনুগ্রহ বা প্রীতি প্রদর্শন করেন যার ফলে প্রীতিভাজন ব্যক্তি অন্য একজনের ন্যায় সঙ্গত দাবী থাকা সত্বেও অধিকতর সুবিধা ভোগ করেন। অনুপযুক্তকে বিশেষ স্থানে নিয়োগ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ কাজ কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দেওয়াও দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার।

আত্মসাৎঃ আত্মসাৎ নগদ অর্থ হতে পারে, আবার মজুদ বা ভান্ডার সংরক্ষিত মালামালও হতে পারে। যখন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ভান্ডারে সংরক্ষিত মালামাল সরকারী কাজের জন্য সরবরাহ না করে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহারপূর্বক সরকারের স্বার্থ এবং অর্থের ক্ষতি করে তখন তাকে আত্মসাৎ বলে। ব্যক্তি কর্তৃক অর্থ ও সম্পদ অবৈধভাবে দখল বা লাভ করা আত্মসাতের আওতায় পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য

৫.১ দুর্নীতি নামক এ সামাজিক ব্যাধির বৈশিষ্ট্য বিচিত্র রূপ। ইহা সমাজের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির গতিকে বাধাগ্রস্ত করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং ব্যাপকভাবে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুবিধাবাদী ব্যক্তি বিশেষের হাতে সম্পদকে পুঞ্জিভূত ও কুক্ষিগত করে। কালো টাকার পাহাড় জমে উঠে দুর্নীতিবাজ লোকদের হাতে। এতে এ সকল সুবিধাবাদী দুর্নীতিবাজ লোক অবৈধ অর্জিত সম্পদ বিদেশে পাচারে প্রয়াসী হয়। দেশ থেকে সম্পদ পাচার হয় দেশান্তরে। সম্পদের সুষম বন্টন হয় বাধাগ্রস্ত, ফলশ্রুতিতে দেশে বিনিয়োগের ও উৎপাদন হয় ক্ষতিগ্রস্ত, ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ হ্রাস পায়, দ্রব্য মূল্যের হয় উর্ধগতি, ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। দুর্নীতির এ দুষ্ট বলয় দেশকে দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্রতর করে ফেলে।

৫.২ উপরের আলোচনা থেকে দুর্নীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়ঃ

১. দুর্নীতি ক্ষমতাবান অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে;
২. জনসমর্থনহীন সরকার ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে সুবিধাবাদীদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে থাকে;
৩. দুর্নীতি ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা, দ্রুত ধনসম্পত্তি অর্জন অথবা দারিদ্রের কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে;
৪. সমাজের উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি, এর দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করে থাকে;
৫. দুর্নীতি সমাজের কোন নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং সমাজের প্রতিটি স্তরেই এর অশুভ প্রভাব ফেলে;
৬. দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের আন্তরিকতার অভাব দুর্নীতি বিস্তারের সহায়তা করে থাকে;
৭. সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করা হলে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করে;
৮. দুর্নীতি, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের লাভবান করলেও বাকী সকল লোকের জন্য ক্ষতিকারক;
৯. দুর্নীতির ফলে দ্রুত সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে;
১০. দুর্নীতির ফলে সরকারী সম্পদের অপচয় ঘটে;
১১. দুর্নীতি সরকারের উন্নয়নমূলক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে;
১২. দুর্নীতি দেশ ও সমাজের জন্য সর্বদাই নেতিবাচক;
১৩. দুর্নীতি সম্পদের সুষ্ঠু বন্টণে বাধার সৃষ্টি করে;
১৪. দুর্নীতির ফলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়;
১৫. দুর্নীতির ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায়। মাথা পিছু আয়ের হার কমে যায়;
১৬. দুর্নীতির ফলে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়;
১৭. দুর্নীতি সমাজ ও দেশকে দরিদ্র হতে দারিদ্রতর করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ ১৯৭২-৯৬ সন পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যুরোর পরিসংখ্যানে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্রঃ

৬.১ স্বাধীনোত্তরকালে বাংলাদেশে দুর্নীতির অভিযোগ, মামলা ও তদন্ত চিত্র নিম্নে তিনটি সারণীতে দেওয়া গেল। এর পূর্ববর্তী সময়ের কোন তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোতে সংরক্ষিত না থাকার ফলে তা দেওয়া সম্ভব হলো না। ১নং সারণীতে ১৯৭২-৮০ সন

পর্যন্ত এবং ২নং সারণীতে ১৯৮১-৯০ সন পর্যন্ত এবং ৩নং সারণীতে ১৯৯১-৯৬ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগ, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ, দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা, দাখিলকৃত চার্জশীটের সংখ্যা, অনুমোদনকৃত চার্জশীটের সংখ্যা, বিচারে সাজা প্রাপ্তির সংখ্যা এবং খালাসের সংখ্যা দেওয়া হলোঃ

সারণী-১
(১৯৭২ - ১৯৮০)

সন	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীটের সংখ্যা	এফ, আরটির সংখ্যা	সাজার সংখ্যা	খালাসের সংখ্যা
১৯৭২	৫৫০৯	৩২৭৯	৪৫৭	৩২৭	১৩০	২০০	১০৯
১৯৭৩	৮৮৬৬	৪৫৫০	৬৬৭	৪৫২	২১৫	২২৮	১৯২
১৯৭৪	৫৮৬৭	৭০০৯	৯২৭	৬৪৭	২৮০	৩৭০	১৮৮
১৯৭৫	৭৪২৪	৭৫২১	৮০৬	৪৩১	২৭৫	১৮৫	১৪১
১৯৭৬	৭১০৭	৯২২২	৮৬৬	৬২২	২৪৪	২০০	১২০
১৯৭৭	৭২৯১	৮৭৬৬	৭৮৬	৫৩০	১৬৫	৯৫	৫৪
১৯৭৮	৬৪৮৩	৮২৮৯	১০৪৬	৮৫২	১৯৪	১৮৫	১৩০
১৯৭৯	৭৪৮১	৭১৫২	১৩৮৭	৮৭৪	৫১২	১২০	১০৩
১৯৮০	৮৪৮৯	৭৯৮৫	১৪২৫	৭৯৬	৬২৮	৮০	৩২
মোট	৬৪৫১৭	৬৩৭৭৩	৮৩৬৭	৫৬৩১	২৬৪৩	১৬৬৩	১০৬৯

সারণী-২
(১৯৮১ - ১৯৯০)

সন	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীটের সংখ্যা	এফ, আরটির সংখ্যা	সাজার সংখ্যা	খালাসের সংখ্যা
১৯৮১	৮৩৮৬	৯২৫২	১২৮১	৬৯৫	৫৮৫	৫৫	৩৯
১৯৮২	১১৯৪৩	৯৮০৩	১২৩০	২৩১৯	৪১১	৫৪৮	২৫৯
১৯৮৩	১০১৪৬	৯৮৯৩	১৯৪৪	১২৭২	১১৭	৯২৫	৭৫৭
১৯৮৪	১১৯২০	১০৫৫১	১৬৪৫	১১৫০	২৯৬	৩২৩	৩১৮
১৯৮৫	১৩৭৪০	১৩৫৪৬	১৫৭৮	১০০৫	২৩৬	২১১	৩৩৪
১৯৮৬	১১৪০৫	১২৭৮৩	৮৪২	৫০১	১৮৬	২৫৮	৪৪৪
১৯৮৭	১০৫৫	৮৫৬৮	১৩২৫	৪০৬	১৩৯	২৩৫	২২৫
১৯৮৮	৮৮৪৯	৭৭৩০	১১৮৭	৭০৮	৭১	২০১	২২৫
১৯৮৯	৭৩২৮	৯৬৪৮	৮৫৬	৬২৭	৭৯	২৫০	৩১৫
১৯৯০	৩২৮৮	৯৬৬৯	৪৯২	৬০২	১১৯	৩০২	৩১৫
মোট	৯৭৫৬০	১০৪৪৩	১২৩৮০	৯২৮৫	২২৩৯	৩৩০৮	৩২৩১

সারণী-৩
(১৯৯১ - ১৯৯৬)

সন	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীটের সংখ্যা	এফ, আরটির সংখ্যা	সাজার সংখ্যা	খালাসের সংখ্যা
১৯৯১	৩৩৯৪	৩০৫৮	৫৯৬	৪৩৩	১০৪	৩৪৩	৩৬৩
১৯৯২	৫২৯৬	৫১৬১	১০২১	৭৬৩	১৮৭	২৪৯	৩১৫
১৯৯৩	৬০৮৫	৬৭৭৩	১৩৮৪	১০৩০	২৪২	১৫৯	২৭৪
১৯৯৪	৬৫৫৯	৫৯৪৬	১৬৬১	১২০১	১২৯	২১৫	২৮৬
১৯৯৫	৬৩৯৫	৪১৭৩	৮১৭	৭৬৪	১৬৭	২৪৯	৩১৫
১৯৯৬	৪২১৯	৩৩৮৭	৪২৭	৩৫৫	২৩০	২০৪	২৫৪
মোট	৩১৯৪৮	২৮৪৯৮	৫৯০৬	৪৫৪৬	১০৫৯	১৪১৯	১৮০৭

৬.২ তিনটি সারণীতে প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭২-৮০ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৬৪,৫১৭, নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৬৩,৭৭৩ দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৮৩৬৭, চার্জশীটের সংখ্যা ৫৬৩১, এফ, আরটির সংখ্যা ২৬৪৩, সাজার সংখ্যা ১৬৬৩, খালাসের সংখ্যা ১০৬৯, (সারণী-১)। ১৯৮১-৯০ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৯৭,৫৬০, নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ১০০৪৪৩, দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১২৩৮০, চার্জশীটের সংখ্যা ৯২৮৫, এফ, আরটির সংখ্যা ২২৩৯, সাজার সংখ্যা ৩৩০৮, খালাসের সংখ্যা ৩২৩১ (সারণী-২)। ১৯৯১-৯৬ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৩১৯৩৮, নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ২৮৪৯৮, দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৫৯০৬, চার্জশীটের সংখ্যা ৪৫৪৬, এফ, আরটির সংখ্যা ১০৫৯, সাজার সংখ্যা ১৪১৯, খালাসের সংখ্যা ১৮০৭ (সারণী-৩)। উপরের তিনটি সারণীতে বর্ণিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সারণী-২ এ ১৯৮১-৯০ পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগ, দায়েরকৃত মামলা, দাখিলকৃত চার্জশীট, এফ, আরটি, সাজা প্রাপ্তি ও খালাসের সংখ্যা সর্বাধিক। তার মধ্যে ১৯৮২ এবং ১৯৮৩ সালে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মামলায় সাজা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বর্ণিত সময়ে সামরিক আদালতে বিচার হয়। তিনটি সারণীতে দায়েরকৃত মামলা অনুসারে সাজা প্রাপ্তির হার সারণী-৪ এ দেওয়া হলোঃ

সারণী-৪

সারণী নং	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সাজা প্রাপ্তির সংখ্যা	সাজা প্রাপ্তির শতকরা হার %
সারণী-১ (১৯৭১-৮০)	৮৩৬৭	১৬৬৩	১৯.৮৭%
সারণী-২ (১৯৮১-৯০)	১২৩৮০	৩৩০৮	২৬.৭২%
সারণী-৩ (১৯৯১-৯৬)	৫৯০৬	১৪১৯	২৪.০২%

সপ্তম অধ্যায়

৭.০ পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৭.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় যাতে ১০০ জন উত্তরদাতার নিকট দশটি প্রশ্ন রাখা হয়। প্রথম প্রশ্নটি ছিল সার্বিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা এর জন্য দায়ী - ক) নিরক্ষরতা, খ) সার্বিক নৈতিক অবনতি, গ) দারিদ্র, ঘ) সর্বস্তরে দুর্নীতি, ঙ) অন্য কিছু। উত্তরদাতাগণ একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর বা কারণ উল্লেখ করেছেন। উত্তরদাতাগণ সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী লোক, পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীর, উত্তরদাতারা সকলেই শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন নাগরিক। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 'ক' নিরক্ষরতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ৩৩ জন 'খ' সার্বিক নৈতিক অবনতিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ২৮ জন গ) দারিদ্রকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ১৩ জন ঘ) সর্বস্তরে দুর্নীতিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ৪৪ জন। এতে দেখা যায় সমাজের আর্থিক উন্নয়নে সর্বস্তরে দুর্নীতি এক বিরাট অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বস্তুত এ জনমত বিরাজিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য।

৭.২ এ উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি বিদ্যমান ছিল। কোন আমল বা যুগই এ ব্যাধি হতে মুক্ত ছিল না। কোন সময়ে এ ব্যাধির প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটে তা নিরুপণ করার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি হয় - ক) মোঘল আমলে/নবাব আমলে খ) কোম্পানী আমল গ) বৃটিশ আমল ঘ) পাকিস্তান আমল ঙ) স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ আমল এ প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতাগণ উত্তর দিয়েছেন। ক - ৪ জন, খ - ৪, গ - ৩ জন, ঘ - ১৪ জন এবং ঙ - ৮১ জন। ক - গ তে

দুর্নীতির হার সমান বলে দেখা যায়। কিন্তু ঘ অর্থাৎ পাকিস্তান আমল এবং ঙ অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্যাপক হারে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করে বলে সমীক্ষায় জনমতে প্রকাশ পায় যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য।

৭.৩ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কোন সময়ে দুর্নীতির প্রসার হয় সবচেয়ে বেশী উত্তরদাতাদের নিকট এ প্রশ্ন রাখা হয়। ক) সত্তর এর দশকে খ) আশির দশকে গ) আশির দশকের পর হতে ঘ) এ সময় নয় ঙ) অন্য কোন সময়ে। ক - তে উত্তর দেন ২৩ জন, খ - তে উত্তর দেন ৫১ জন, গ - তে উত্তর দেন ৩০ জন অর্থাৎ আশির দশকে দুর্নীতি সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। উত্তরদাতাদের উত্তর সারণী - ২ ব্যুরোর পরিসংখ্যান এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবতার নিরিখে এ উত্তর গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক।

৭.৪ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি সমাজের কোন স্তরে তা নিরুপণ করার জন্য উত্তরদাতাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয়। ক) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ) শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলে ঘ) নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে ঙ) অন্য কিছু। ক - অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি সবচেয়ে বেশী উত্তর দেন ৫৩ জন। খ - রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বেশী উত্তর দেন ২৮ জন, গ) শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলে দুর্নীতি বেশী উত্তর দেন ৪৫ জন। ঘ এবং ঙ তে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এতে দেখা যায় বাংলাদেশে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী মহলে দুর্নীতি সর্বাধিক। এর পরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং তৃতীয়ত রাজনৈতিক মহলে দুর্নীতি বিরাজমান বলে উত্তরদাতাগণ উত্তর দেন।

৭.৫ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির কারণ নিরুপণের জন্য প্রশ্ন রাখা হয়। প্রশ্নে ক) বেতনের স্বল্পতা খ) রাজনৈতিক চাপ গ) পারিবারিক চাপ ঘ) সামাজিক মর্যাদার প্রলোভন ঙ) অন্য কিছু কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। উত্তরদাতাগণ ক) বেতনের স্বল্পতাকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন ৮৩ জন, খ) রাজনৈতিক চাপ উল্লেখ করেন ১৫ জন গ). পারিবারিক চাপ উল্লেখ করেন ১১ জন ঘ) সামাজিক মর্যাদার প্রলোভন উল্লেখ করেন ২৫ জন ঙ) অন্য কিছু উল্লেখ করেন ৩ জন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একই উত্তরদাতা প্রশ্নের একাধিক কারণ চিহ্নিত বা উল্লেখ করেন। উত্তরদাতাগণ সরকারী কর্মচারীদের বেতনের স্বল্পতা যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে বলে তাদের জবাবে উল্লেখ করেন। এর সাথে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রলোভন সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনে প্ররোচিত করে। কারণ দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি হয় না এবং সামাজিকভাবে নিন্দিত না হয়ে তারা বরং সমাজের প্রতিপত্তি ও বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ফলশ্রুতিতে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও এ ব্যাধি সংক্রমিত হয়ে পড়ছে।

৭.৬ সরকারী কর্মচারীদের কোন পর্যায়ে দুর্নীতি বেশী তা নিরুপণের জন্য উত্তরদাতাদের প্রশ্ন রাখা হলে ক) প্রথম শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ে খ) প্রথম শ্রেনীর মধ্যম পর্যায়ের গ) প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক পর্যায়ের ঘ) দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যায়ের ঙ) তৃতীয় শ্রেণী পর্যায়ে এবং চ) চতুর্থ শ্রেণী পর্যায়ে। উত্তরদাতাগণ উত্তর দেন ক-৫৫, খ-৪৫, গ-১৭, ঘ-১১, ঙ-৯ এবং চ-২ জন। এতে দেখা যায় যে ক,খ,গ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী উচ্চ, মধ্য এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বাধিক দুর্নীতি বিদ্যমান বলে উত্তরদাতাগণ মত প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে দুর্নীতি বিদ্যমান এ সম্পর্কে খুব স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা মতামত রাখেন। বাস্তবে আরো ব্যাপকভাবে সমীক্ষা চালানো হলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতেও দুর্নীতি বিদ্যমান তা প্রতিফলিত হতে পারে। তবে এ কথা সত্যি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী যে আকার ও প্রকার দুর্নীতি করে, তার প্রতিক্রিয়া সরকারী কর্মকর্তাদের উচ্চশ্রেণী পর্যায়ে যে দুর্নীতি হয় তার তুলনায় খুবই নগণ্য। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড, উন্নয়ন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না।

৭.৭ দুর্নীতির সামাজিক, নৈতিক এবং আইনগত দিক রয়েছে। দুর্নীতি বলতে কি বুঝায় তা নিরুপণ ও নির্ধারণের জন্য উত্তরদাতাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয় - ক) স্বজন-প্রীতি খ) প্রিয়তোষণ গ) ক্ষমতার অপব্যবহার ঘ) ঘুষ/ আত্মসাৎ/জালিয়াতি ঙ) অন্য কিছু কিনা। উত্তরদাতাগণ জবাব দেন ক-১১ জন, খ-১ জন গ-৩৭ জন, ঘ-৮০ এবং ঙ-নাই। এতে দেখা যায় ঘ-ঘুষ/আত্মসাৎ/জালিয়াতিকেই সর্বাধিক সংখ্যক দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন দ্বিতীয় স্থানে আছে গ- অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার। বস্তুত স্বজন-প্রীতি ও প্রিয়তোষণ দুর্নীতির আওতাভুক্ত এবং এর ফলে সমাজে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। সম্পদের সুষম বন্টন ও ন্যায় বিচার বিপন্ন হয়।

৭.৮ সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের নিকট দুর্নীতির প্রসার ও বিস্তার এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয় ক) সামাজিক মূল্যবোধের অভাব খ) সুশিক্ষার অভাব গ) কর্মসংস্থানের অভাব ঘ) সরকারের আকার বা কলেবর বৃদ্ধি ঙ) দুর্নীতিবাজ লোকদের বিচার, শাস্তি অভাব - এর কোনটি। এতে উত্তর দেন - ক-৪১ জন, খ-১৩ জন, গ-১১ জন, ঘ-১০ জন, ঙ-৫০ জন। উত্তরদাতাগণ একাধিক কারণ চিহ্নিত করেন। সর্বাধিক সংখ্যক উত্তর দেন ঙ অর্থাৎ দুর্নীতিবাজ লোকদের বিচার/শাস্তির অভাব। দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক উত্তর দেন ক অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধের অভাব। তৃতীয় খ অর্থাৎ সুশিক্ষার অভাব, চতুর্থ অর্থাৎ গ কর্মসংস্থানের অভাব এবং পঞ্চম স্থানে ঘ অর্থাৎ সরকারের আকার বৃদ্ধি। বস্তুত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য সমাজে দুর্নীতি প্রসার ও বিস্তার এর কারণ সম্পর্কে যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছে। দুর্নীতিবাজ লোকদের চিহ্নিত করে সঠিক বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা না গেলে দুর্নীতি নির্মূল না করা গেলেও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৭.৯ এ অধ্যায়ে দুর্নীতির ব্যাপকতার মাত্রাক্রমানুসারে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে বলা হলে দেখা যায় যে, ক্রমানুসারে প্রথমে এসেছে কর বিভাগ, পুলিশ বিভাগের নাম, আবার কখনো প্রশাসন বিভাগের নাম, কখনো বিদ্যুৎ বিভাগ, কখনো সচিবালয়, কখনো শিক্ষা বিভাগ, কখনো প্রকৌশল বিভাগ, কখনো খাদ্য বিভাগ, কখনো স্বাস্থ্য বিভাগ, কখনো কৃষি বিভাগ, কখনো ভূমি প্রশাসন, কখনো জরিপ, কখনো হাউজিং সেটেলমেন্ট, কখনো গ্যাস, কখনো ওয়াসা, কখনো রাজউক কখনো ত্রাণ, কখনো বন বিভাগ। এ পর্যায়ে বিচার বিভাগও বাদ যায়নি। কোন কোন উত্তরদাতা এ বিভাগকেও প্রথম স্থানে চিহ্নিত করেছেন। বিচার বিভাগ ও জেলা প্রশাসনে দুর্নীতির এ অবস্থান জনগণ চিহ্নিত করেছেন যা বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। বাদ গেছে পরিসংখ্যান বিভাগ এবং আবহাওয়া বিভাগের মতন দপ্তর যারা আর্থিক লেনদেন সম্পর্কযুক্ত নয়। এতে প্রতীয়মান হয় লাভ লোকসানের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি দপ্তরেই দুনীতি রয়েছে এবং সময়ে এর প্রাধান্য শীর্ষ পর্যায়ে উপনিত হয়।

৭.১০ উত্তরদাতাদের নিকট দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কি করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়। প্রশ্নে ক) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খ) নৈতিক শিক্ষা প্রদান গ) সরকারের আকার সংকোচন ও ব্যয় হ্রাস ঘ) আয়বৃদ্ধি ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং ঙ) দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা এ প্রশ্ন রাখা হয়। উত্তরদাতাগণ ক -১৩ জন, খ-২৫ জন, গ-৫, ঘ-৩৭ এবং ঙ-৬৬ জন উত্তর দেন। এতে দেখা যায় যে, ঙ-তে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা দুর্নীতিবাজদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের মাধ্যমে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা আয় বৃদ্ধি এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার কথা উল্লেখ করেন। চতুর্থ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং পঞ্চম পর্যায়ে সরকারের আকার সংকোচন ও ব্যয় হ্রাসের কথা বলেন ৫ জন উত্তরদাতা। বস্তুতপক্ষে দুর্নীতিবাজ লোকদের সামাজিকভাবে চিহ্নিত করে প্রতিরোধ ও নিন্দা জ্ঞাপন এবং আইনগতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক দুষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার কমে আসবে এবং নিয়ন্ত্রিত থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অষ্টম অধ্যায়

৮.০ বিরাজিত বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা

৮.১ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে যে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে ডঃ ইউনুসের মতে তা কমপক্ষে এক লাখ কোটি টাকা। হিসাব মতে ফেরতযোগ্য ঋণের

পরিমাণ হবে ৬০,০০০ কোটি টাকা। মাথাপিছু ঋণ প্রায় ৫,০০০ টাকা, গড় মাথাপিছু আয় ২২৪ মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমাদের জাতীয় সম্পদ আর ঋণের অনুপাত হলো ৫২% অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ৫২% বিদেশীদের কাছে দায়বদ্ধ। বর্তমানে শিক্ষার হার ৩৭% এর নীচে, প্রায় ৮০% লোক অপুষ্টিতে ভোগে, ৫৫% লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এ দেশের গ্রামের প্রায় ৭০% লোক ভূমিহীন। গ্রামের ৫০% মহিলা মাত্র দৈনিক ১০০০ ক্যালরি খাবার পায় যেখানে দরকার ২৩০০ ক্যালোরি।[৯]

৮.২ স্বাধীনতার পর বৈদেশিক ঋণের বোঝা ছিল ৩৫০ কোটি টাকা আর বর্তমানে তা এসে দাড়িয়েছে ৬০,০০০ বা ৬৫,০০০ কোটিতে। এখন বছরের প্রায় ২০০০ কোটি টাকা সুদ ও আসল (debt service liability) হিসেবে পরিশোধ করতে হচ্ছে। রপ্তানী বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ যা রপ্তানী করে তার তিনগুণ আমদানী করে।

৮.৩ প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের টাকার অপচয়, অপব্যবহার আত্মসাৎ এর অভিযোগ রয়েছে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে, যার জন্য দায়ী প্রশাসনের অদক্ষতা ও দুর্নীতি। মহা হিসাব রক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মোট চুরি হয়েছে ৮০৯ কোটি টাকা, আত্মসাৎ হয়েছে ১০৫ কোটি টাকা, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিধি বহির্ভূত ব্যয় প্রায় ৩৩৬২ কোটি টাকা। এছাড়া মাত্র ৯টি মন্ত্রণালয়ে অপচয় হয়েছে প্রায় ২৫০৭ কোটি টাকা। মোট আদায় যোগ্য টাকা যা আদায় না করে এর বিনিময়ে নিজে লাভবান হওয়া যা অন্যকে লাভবান করার ঘটনা ঘটে। এরুপ অর্থের পরিমাণ ১১,০০০ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে শুধুমাত্র ব্যাংকিং খাতেই অনাদায়ী ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। বর্তমানে তা এসে দাড়িয়েছে ১১,৫০০ কোটি টাকায়। সরকারী সম্পদ বেহিসাবী খরচ করার প্রক্রিয়া চালু হয় পাকিস্তান সামরিক শাসনামলে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২-৬৯ সাল পর্যন্ত মৌলিক গণতন্ত্রের নামে ১০০০ টাকা অপচয় করা হয়, যার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। একই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে এরশাদ আমলে ১৯৮৫-৯০ পর্যন্ত ১০০০ কোটি টাকা উপজেলা পদ্ধতির নামে খোলা হাতে খরচ করা হয়। সরকারীভাবে দুর্নীতির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ বা মদদ দান বলা যেতে পারে। সরকার বা প্রশাসন যন্ত্রে দুর্নীতি সমাজে নিম্নবর্ণিত সঙ্কটজনিত পরিস্থিতি নিয়ে আসেঃ

ক) আইনের ভয় থাকে না

খ) অন্যায় করে অপরাধ বোধ আসে না

গ) লোকেরা দুর্নীতিবাজদের নিন্দা করে না

ঘ) কালো টাকা দিয়ে সম্মান কেনা যায়

ঙ) সৎ লোকেরা অসৎ লোকদের ভয় পায়

চ) অসৎ লোকদের দাপটে সৎ লোকেরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না

ছ) অসৎ লোকদের পেছনে রাজনৈতিক ক্ষমতার সমর্থন থাকে

জ) কালো টাকা দিয়ে বিচার ক্রয় করা যায়

৮.৪ বাংলাদেশ বর্তমানে বিরাজিত পরিস্থিতি এমন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থে কাজ করে। সমাজের স্বার্থে কাজ করার লোকের বড়ই আকাল। এ পরিবেশের জন্য সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীই দায়ী। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অভাবে বাংলাদেশে সামাজিক অবক্ষয় এমন এক পর্যায়ে থেকে এসেছে যে বর্তমানে সমাজে অনৈতিক বিষয় ও ব্যক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে যেমন -

ক) কন্যার পিতা ম্যাজিস্ট্রেটের বদলে কাষ্টমস ইন্সপেক্টর জামাই হিসাবে পেতে চান।

খ) শিক্ষকগণ তাদেরকেই যত্ন করে পড়ান যারা তাঁদের কাছে প্রাইভেট পড়ে।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সারা বছর এনজিওদের টিকেটে বারবার বিদেশে সফর করেন বা কনসাটেন্সি করেন কিন্তু এর জন্য কারও অনুমতি নেন না।

ঘ) আমলারা বেনামিতে কনসালটেন্সি করেন এবং অনেকের স্ত্রী পুত্র বা কন্যারা এনজিওতে মোটা টাকার বেতনে চাকুরী করেন।

ঙ) প্রাইভেট ব্যাংক বলে পরিচিত টাকার খনি হতে বালতি ভর্তি টাকা পানির মত তুলে নিচ্ছেন যারা ব্যাংকের পরিবার ভিত্তিক পরিচালক মন্ডলী।

চ) ব্যাংকের কোন কোন রক্ষক ম্যানেজার ও তার সহকর্মী ভূয়া একাউন্ট খুলে, কোন পার্টির সম্পূর্ণ টাকা ঐ একাউন্টে স্থানান্তর করে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছেন। প্রয়োজনে ধর-পাকড় করে মামলা রহিত করছেন বা সিভিল কোর্টে আশ্রয় নিচ্ছেন।

ছ) মাদ্রাসার সুপার, মাদ্রাসার নামে বরাদ্দকৃত টিন বিক্রি করে ঐ টাকা আত্মসাৎ করছেন।

জ) বড় বড় প্রকল্পে - দাতাদের সাথে বিদেশী সরবরাহকারীদের সাথে আঁতাত করে বহু সম্মানী ও শক্তিধর লোকেরা নিজেদের লাভের বিনিময়ে দেশের স্বার্থ বিক্রি করে দিচ্ছেন।

৮.৫ পূর্বে বর্ণিত অবস্থার সাথে বর্ণিত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ঢাকা কোর্টে - ঢাকা জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো অফিস কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় রাষ্ট্রপতি থেকে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ে ৯৫ জন এবং একই সময়ে রুজুকৃত মামলার নন গেজেটেড কর্মচারী, ব্যাংকের কর্মচারী, মেম্বার, চেয়ারম্যান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী লোক ২৭০ জন, সর্বমোট ৩৬৫ জন এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বর্ণিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আইন প্রয়োগ করা হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বলের প্রতি। দায়েরকৃত

মামলার মোট ৩৬৫ জন আসামীর মধ্যে ৯৫ জন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ লোক। বাকীরা সাধারণ ও দুর্বল মানুষ।[১০]

৮.৬ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দায়েরকৃত মামলা তদন্ত শেষে বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কোর্টে সোপর্দ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে বিচার কার্য সমাপ্ত করা যায় না। বিচারাধীন মামলার একটা সিংহভাগ মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ ও অন্যান্য কারণে স্থগিত করা আছে। উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন যে এ সকল অধিকাংশ মামলার আসামী সমাজের বিত্তবান প্রবাবশালী ব্যক্তি, উচ্চশ্রেণীর আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

নবম অধ্যায়

৯.০ উপসংহার

৯.১ বিশ্বের দেশে দেশে দুর্নীতি বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে এর প্রকোপ কম নয়। এ অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। পূর্ব হতে সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ ব্যাধি বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান আমলে তা বেড়ে উঠে ধারাবাহিকভাবে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এর প্রসার ও বিস্তার ঘটে যা সমীক্ষার প্রশ্নের উত্তরদাতাদের জবাবে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত চিত্র জনমতের প্রতিফলন এবং বাস্তব অবস্থাও বটে। সরকারের সকল পর্যায়ে, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, অর্থলগ্নি সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীমহল, রাজনৈতিক মহল, সমাজ, ব্যক্তি, সমষ্টি সবকিছুই বাদ পড়েনি এ ব্যাধির ছোবল থেকে। শহর বা গ্রাম কোন স্থান বিশেষ রেহাই পায়নি এ ব্যাধির রাহুগ্রাস থেকে।

৯.২ প্রতিনিয়ত প্রচুর আলোচনা সমালোচনা হয় দুর্নীতি নামক ব্যাধি প্রসঙ্গের। ব্যক্তি ও সমষ্টি সকলেই এ প্রসঙ্গে সমালোচনায় মুখর। দৈনিক পত্র পত্রিকা, প্রচার ও সংবাদ মাধ্যম সকল স্তরেই এ প্রসঙ্গে সংবাদ বা তথ্য প্রকাশিত হয়। তবে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ বা প্রতিকারের কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।

৯.৩ সরকারী পর্যায়ে ১৯৫৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের সৃষ্ট দুর্নীতি দমন সংস্থা, বর্তমানে যা দুর্নীতিদমন ব্যুরো হিসেবে দুর্নীতি দমন কাজে নিয়োজিত আছে তার সম্পর্কেও জনমত সমীক্ষায় একই মতামতের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত দুর্নীতি দমন ব্যুরো একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা সমাজ ও পরিবেশ হতে কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত এ প্রতিষ্ঠানও দুর্নীতি নামক ব্যধিতে আক্রান্ত যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাধি যে প্রতাপ এবং প্রকোপ নিয়ে মহামারী আকারে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে তাকে

১০। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় রোধে দূর্নীতি দমন ব্যুরোর ভূমিকা, মোহাম্মদ শহীদুল আলম, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ঢাকা। ১লা এপ্রিল, ১৯৯৫

একই শক্তিতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল সংগঠনকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৯.৪ এ জন্য প্রয়োজন সকল স্তরে জনমত গড়ে তোলা। জনমত গড়ে তুলতে হলে জনগণকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার। শিক্ষা প্রসারে সরকারী কর্মসূচী রয়েছে। সরকারী কর্মসূচীর পাশাপাশি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকেও এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার প্রসার এর প্রসঙ্গে কথা আসতে পারে সমাজে বিদ্যমান দুর্নীতিতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই প্রধান। সমীক্ষায় প্রাপ্ত জরিপ মতামতে তাই দেখা যায়। শিক্ষার প্রসার এর সাথে নৈতিক মূল্যেবোধের সংযোজন, কর্ম সংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এ সকল বিষয়ে সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এর সাথে নিশ্চিত করতে হবে সরকারের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

৯.৫ বিশ্বব্যাপী সকলেই আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ দেশের পত্র-পত্রিকাও পিছিয়ে নেই। সমাজের সচেতন লোক মাত্র শঙ্কিত। খোদ বিশ্ব ব্যাংক যেখানে এ জন্য চিন্তিত ও কঠোর মত পোষণ করেন, এমতাবস্থায় আমাদের আর সময় ক্ষেপণ করার কোন সুযোগ নেই। সরকার ও সমাজের সকল স্তরেই ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্নীতি নামক এ ব্যাধির সংক্রমণ ও বিস্তার রোধের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা, জনগণের ঐকান্তিক সহায়তা এবং আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ। এ নিশ্চিত করা গেলে বিচার ব্যবস্থা এবং বিচারক সক্ষম হবে বিচার কার্য সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সম্পাদনে। ফলশ্রুতিতে ফিরে আসবে জনমনে আস্থা, মানুষ বিব্রতবোধ করবে না অন্যায়কে ঘৃণা করতে এবং আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে। এর মাধ্যমে সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতি নামক দুষ্ট সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ করাই হলো আজকের সমাজ সচেতন সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেশণ, সমাজের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে জনমতে প্রতিফলিত।

ক) সরকার ও জনগণের অঙ্গীকার

খ) প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

গ) আইনের নিরপেক্ষতা প্রয়োগ

ঘ) দুর্নীতি দমন আইনের সংস্কার ও ব্যুরোর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণ বিধি প্রণয়ন

ঙ) সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অনুশীলন

চ) শিক্ষার প্রসার

ছ) কর্ম সংস্থান

জ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সরকারের ব্যয় হ্রাস

ঝ) দ্রব্যমূল্যের সমানুপাতিকহারে বেতনভাতা নির্ধারণ।

পরিশিষ্ট-'ক'

১। ১৯৫৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের (এ্যাক্ট নং - ২৬) আওতাভূক্ত অপরাধসমূহ;

২। ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের (এ্যাক্ট নং -২) আওতাভূক্ত অপরাধসমূহ;

৩। দন্ডবিধির ১২০ বি, ১৬১ থেকে ১৬৯, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ২০১, ২১৭, ২১৮, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৭৯ থেকে ৩৮২, ৪০৩ থেকে ৪০৯, ৪১১, ৪১৪, ৪১৭ থেকে ৪২০, ৪৬৫ থেকে ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৭এ, ৪৮৯এ থেকে ৪৮৯ই এবং ৫১১ ধারার অপরাধসমূহ;

৪। ১৯৫৬ সনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৫। ১৯৫৩ সনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং হোর্ডিং বিরোধী) আইনের দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৬। ১৯৫২ সনের চোরাচালান প্রতিরোধ আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৭। ১৯৪৮ সনের হোর্ডিং ও কালোবাজার বিরোধী আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৮। ১৯৫০ সনের আমদানী ও রপ্তানী (নিয়ন্ত্রণ) আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

৯। ১৯৫০ সনের বাংলাদেশ (খাদ্য শস্যের চোরাচালন) আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ সমূহ;

১০। ১৯২৩ সনের অফিসিয়াল সিক্রেট আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

১১। ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ১৫৬ ধারায় দন্ডনীয় অপরাধ;

১২। ১৯৫২ সনের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

১৩। ১৯৪৭ সনের বৈদেশিক মুদ্রা বিধি আইনের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

১৪। ১৯৭০ সনের বাংলাদেশ পাসপোর্ট আদেশের আওতায় দন্ডনীয় অপরাধসমূহ;

১৫। উপরে ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত ক্রমিকে বর্ণিত অপরাধসমূহের উদ্যোগ, যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্র;

১৬। ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ তফশিলভুক্ত অপরাধ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশের ২নং আর্টিকেলের ৪নং ক্লজে বর্ণিত মারাত্মক অপরাধ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫); এবং

১৭। ১৯৪৮ সনের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আদেশ।

গ্রন্থপঞ্জী

আলম, মোহাম্মদ শহীদুল, (১৯৯৫), বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় রোধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ভূমিকা, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ঢাকা।

বিশ্ব ব্যাংক, ১লা জুলাই, (১৯৯৬), গভার্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৬), ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিম বঙ্গরাজ্য পরিষদ, কলিকাতা।

মিরডাল, গুনার, (১৯৬৮), এলেন লেন, দি পেওউইন প্রেস, লন্ডন।

হাকিম, খান বাহাদুর আব্দুল (১৯৭৬), বাংলা বিশ্বকোষ-দ্বিতীয় খন্ড, । নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ

মোঃ হাসিবুর রহমান*

১.১ ভূমি আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি

বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা এক যুগের বা এক শতাব্দীর কার্যক্রমের ফল নয়। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতার আলোকে ভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামো বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ভূমি আইনের সূচনা হয় বৃটিশ আমল থেকে। ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট, এর আগে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮৫৮ সালের রেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৯০-১৯৪০ সময় ব্যাপী ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা সিএস খতিয়ান তৈরি এবং ১৯৩৮ সালের বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিন্যু বা ফ্লাউড কমিশনের কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে রিপোর্ট পেশ করে। সেটা সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য ১৯৪৪ সালে বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হয়। জমিদার কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনার কোনো উন্নয়ন নয় বরং তাদের মাত্রাতিরিক্ত ভোগ বিলাস এবং সীমাহীন স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে এই কমিটি ফ্লাউড কমিশনের সাথে ঐক্যমত পোষন করেন। বলতে গেলে জমিদারী প্রথার বিলোপ তথা প্রজাস্বত্ত্ব আইনের বীজ যেন এর মধ্যেই নিহিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে বাংলার কৃতী সন্তান শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর নেতৃত্বে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন প্রণীত হয় যা পরবর্তী কালের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইনের ভিত্তি প্রস্তর।

১.২ প্রাগৈতিহাসিক আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা

মনুসংহিতা থেকে জানা যায়, জঙ্গল পরিষ্কার করে যে আবাদী জমি তৈরী করত, সেই হতো জমির দখলদার। সম্রাট অশোকের সময় কৃষির আয় হতে রাজস্ব হিসেবে গ্রহণ করা হতো এক দশমাংশ। রাজার অংশই হচ্ছে রাজস্ব। তখনকার সময়ে কৃষক, গ্রামীন সমাজ এবং রাজশক্তি এই তিনটি শক্তিকে কেন্দ্র করেই সমাজ ব্যবস্থা আবর্তিত হতো।

১.৩ মুসলিম আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা

১২০১ সালে রাজা লক্ষণ সেনের পরাজয় অর্থাৎ মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পর হতেই বাংলার কিছু এলাকায় শুরু হয় মুসলিম শাসন। শুরু হয়

---

*পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

সুলতানি আমল। মুসলিম সুলতানগণ মনসবদার রাখতেন। তাঁদের অধীনে থাকত পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈন্য এবং সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য দেয়া হতো লাখেরাজ জমি। বিভিন্ন ধরণের লাখেরাজ জমি ছিল। যেমন আলতামাঘা লাখেরাজ আলশাঘা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি লাল সীলমোহরের নাম। ঐ সীলমোহর অঙ্কিত কাগজে লাখেরাজ দেয়া হতো তাই আলতামাঘা লাখেরাজ। আয়মা লাখেরাজ - এই ধরণের লাখেরাজ জমি সাধারণত ধর্মীয়গুরু বা উপদেষ্টাদের বরাদ্দ দেয়া হতো। এর বিনিময়ে তাঁরা প্রয়োজনের সময় সুলতান বা বাদশাহ্ কে বিভিন্ন তথ্য বা পরামর্শ দিতেন; যা ছিল তাঁদের জীবিকা-উপার্জনের উপায়। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সেনাপতিদের বরাদ্দ দেয়া হতো লাখেরাজ জায়গীর। তাঁদের বলা হতো জায়গীরদার। ইসলাম ধর্ম প্রচারকদেরকে যে লাখেরাজ জমি বরাদ্দ দেয়া হতো তাকে বলা হতো মাদাদ্‌মাশ। মসজিদ পরিচালনার জন্য যে লাখেরাজ জমি বরাদ্দ দেয়া হতো তার নাম ছিল নাজারাত এবং দরবেশ বা সাধু-সন্তুদের জন্য লাখেরাজ জমির নাম সায়রখাল।

১.৪ জমিদারী প্রথার প্রবর্তন

১৬৫০ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি। ফলে তখন কারো অভাব ছিল না। জমি ছিল খুবই উর্বর। জমিদারী প্রথা ইতোপূর্বেও ছিল তবে তেমন বিধিবদ্ধ ভাবে নয়। বেশীর ভাগ রাজা বাদশাহগণই রাজ কর্মচারী দিয়ে সরাসরি খাজনা আদায় করতো। তবে ইংরেজ আমলেই চিরস্থায়ী, ২ সালা, ৫ সালা এবং ১০ সালা প্রভৃতি বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারী ব্যবস্থার পত্তন করা হয়, যা ছিল অনেকটা ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক আদলে গড়া। নবগঠিত এই মধ্যস্বত্ত্বভোগী সামন্ত শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থেই ইংরেজের চাটুকার এবং নানা প্রকার অন্যায়ের-অবিচারের দোসর হিসেবে কাজ করেছে।

১.৫ সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী, শেরশাহ ও সম্রাট আকবরের আমলে ভূমি সংস্কার

সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৩৫৭-৮৯ সময় পর্যন্ত সিকান্দার শাহ যে জরিপ প্রচেষ্টা চালান সেটাই প্রথম জরিপ, যদিও তা তেমন বিজ্ঞান সম্মত ছিল না। গজ দিয়ে জমি মাপা হতো। যা থেকে সিকান্দরী গজ কথাটি প্রচলিত হয়েছে। শের শাহ - এর আমলে কবুলিয়ত ও পাট্টা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। রাইয়ত বা প্রজারা রাজাকে বা জমিদারকে দিত কবুলত যাতে থাকতো জমির হিসাব ও খতিয়ান আর জমিদার প্রজাকে দিত পাট্টা যাতে থাকতো নির্দিষ্ট খাজনার পরিমাণ। এ সময় থেকেই খতিয়ান ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। শের শাহ - এর আমলে চাক্‌লা, পরগনা এবং গ্রাম এই তিনটি

পর্যায়ে জমিদারী ভাগ করা হতো। চাকলাদার ছিল চাকলার মালিক। চাকলার অধীনে ছিল জমিদারদের পরগনা। পরগনার অধীন ছিল অনেক গ্রাম। চাকলার জমিদার অর্থাৎ বড় মাপের জমিদার বা ভূস্বামীদের সাথে রাজার সরাসরি যোগাযোগ থাকতো। সম্রাট আকবরের আমলে উপমহাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় আরও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য তিনি রাজা তোডরমল এর নিকট বহুলাংশে ঋণী। রাজা তোডরমল ইতোপূর্বে শের শাহের অধীনে দায়িত্ব পালন করে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

১.৬ পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী দেওয়ানী আমল

১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট আওরঙ্গজেব - এর পৌত্র সম্রাট শাহ্ আলম - এর নিকট হতে ইংরেজগণ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ান হতে নায়েব নাজিম নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ খাজনা আদায় ও বিচারের ভার দুইই তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হলো। এরপর ওয়ারেন হেস্টিংস এর সময় নায়েব নাজিম - এর কাজকর্ম তদারক করার জন্য ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। এই সুপারভাইজার পদেরই বিবর্তিত রুপ এক সময়ের কালেক্টর বা বর্তমানের রেভিন্যু কালেক্টর।

১.৭ আমীর ও দেওয়ানের দ্বারা খাজনা আদায় এবং Pit's India Act

১৭৭৩ সালে পূর্বোক্ত কালেক্টর পদ বিলোপ করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল যে তারা কৃষকদের প্রতি সদয় ছিলেন। ফলে খাজনা আদায় হতো কম। তাই পুণরায় ১৮১৯ সাল থেকে আমীর ও দেওয়ানদের দ্বারা খাজনা আদায় করা শুরু হলো। অবশ্য ১৭৮১ তে কালেক্টর এর পদ আবার প্রবর্তিত হয় কিন্তু তাদের দায়িত্বের প্রকৃতি পাল্টে যায় এসময় তাদের দায়িত্ব হলো আদালতের বিচার কার্য সম্পাদন। পুলিশ ফৌজদারী বিচারকার্য পরিচালনা করতো এবং কালেক্টর দেওয়ানী আদালত পরিচালনা করতো। ইতোমধ্যে Pit's India Act পাশ হলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার একই বিচারক পরিচালনা করতে পারতেন।

১.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন

১৭৯০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ছিল ১০ সালা বন্দোবস্ত। ঠিক এর মধ্যেই (১৭৯৩ সালে) লর্ড কর্ণওয়ালিস লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর - এর অনুমোদনক্রমে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। এর ফলে এতদিন যে কৃষকগণ ছিলেন দখলকৃত জমির স্বাধীন মালিক তারা পরিণত হলেন স্বত্ত্বহীন এবং পরাধীন প্রজায়। এই ব্যবস্থায় জমিদারকে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সূর্যাস্তের পূর্বেই জমিদারীর জন্যে দেয় খাজনা পরিশোধ করতে হতো। অপারগতায় জমিদারী নিলামে চড়তো। বন্দোবস্তের শর্তের বাইরে কোনো প্রকার কর আদায় করা যেত না। কর না দিলে গরু, লাঙ্গল

প্রভৃতি আটক করা হতো। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ ক্ষুব্ধ হয়। ফলে ১৭৯৫ সালে সরকার জমিদারদের পক্ষে বেশ কিছু ছাড় প্রদান করেন।

১.৯ রেন্ট এ্যাক্ট

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে বছর ক্ষমতায় এলেন সেই বছরই অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে রেন্ট এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের ফলে একজন প্রজা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন থেকে আদালতের রায় ব্যতীত প্রজাকে তার বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা যেত না, পাট্টা কবুলিয়তের শর্ত কার্যকরী হলো, জুলুম করে অতিরিক্ত কর আদায় করা যেত না, খাজনা গ্রহণের রশিদ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হলো।

১.১০ রেন্ট কমিশন ও বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্টঃ

১৮৭৯ সালে রেন্ট কমিশন গঠিত হয়। ১৮৮০ সালে এই কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। এরপর ১৮৮৫ সালের ১৪ই মার্চ লন্ডনের আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশ হলো। এর শর্তানুযায়ী ১২ বছর দখলে থাকলে প্রজাকে ঐ দখলী স্বত্ত্ব থেকে উচ্ছেদ করা যেত না। এই আইন পাশ হওয়াতে প্রজারা জমির সম্পূর্ণ মালিক না হলেও তারা জমি হস্তান্তর করতে পারত এবং ওয়ারিশসূত্রে মালিক হতে পারত। শুধু বড় বড় গাছ কাটতে পারতো না।

১.১১ সিএস, এসএ, এবং আরএস খতিয়ান, ভূমি জরিপ ও স্বত্ত্বলিপি

১৮৮৮ হতে ১৮৮৯ পর্যন্ত চট্টগ্রামের রামুতে পরীক্ষামূলক ভূমি জরিপ হয়। তারপর ১৮৯০ হতে ১৮৯৪ পর্যন্ত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে পরিচালিত হয়। জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইনের পরে হয় এসএ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে হয় আরএস খতিয়ান। অনেক স্থানে যা এখনো সম্পন্ন হয়নি। যেমন, সিলেট, কুমিল্লা, নওগাঁ, দিনাজপুর প্রভৃত স্থানে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এটি সম্পন্ন হয়নি বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অসহযোগিতার জন্য।

১.১২ জমা বিভক্তিকরণ, জমা একত্রিকরণ, স্বত্ত্বলিপি, নামজারি, মিসকেস ও বুজারাত

একই দাগ নম্বরে আলাদা আলাদা মালিকের খতিয়ান আলাদা করার নাম জমা বিভক্তিকরণ। আর একই মৌজার বিভিন্ন দাগের খতিয়ান (একজন মালিকের) যদি বিভিন্ন নম্বরে থাকে তবে সেগুলো একই খতিয়ান নম্বরে আনার নাম জমা একত্রিকরণ। একটা দাগে কোনো লোকের জমি নিয়ে বিরোধ লাগলে ঐ দাগে কার জমি কতটুকু তা কানুনগো পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দেন ও বুঝিয়ে দেন। জমি কমবেশী থাকলেও তখন ধরা পড়ে। ঐ দাগে কোন খতিয়ানে কোন মালিকের কতটুকু জমি

আছে স্বত্বলিপিতে তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। এই বুঝিয়ে দেওয়ার নামই বুজারাত। নাম খারিজ করার পর যে মাঠ পর্চা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় খসড়া স্বত্বলিপি। এটা চুড়ান্তভাবে ছাপানোর আগে কোন গরমিল সংশোধনের জন্য থানা ভূমি অফিসে মিসকেস করা যায়; ছাপানো হয়ে গেলে তখন আর জমি কমবেশী হলে কানুনগোর নিকট আপিল করা চলে না। সে অবস্থায় দেওয়ানী আদালতে স্মরণাপন্ন হতে হয়। নামজারী - দরখাস্ত মুলেও হয়, আবার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত তথ্য থানা ভূমি অফিস এবং জেলা রেভিনিয়্যু অফিসে প্রেরণের পর দলিলে উল্লেখিত তফসিল ভূমি অফিসের রেজিষ্ট্রারের তফসিলের সাথে মিলে গেলে আপনিও হয়। তবে এতে সময় বেশি লাগে।

১. ১৩ মৌজা ম্যাপ

বড় বড় মৌজায় একাধিক নক্শা থাকতে পারে তবে ছোট মৌজায় একটাই নক্শা থাকে। ডিজিএলআর অফিস বা মহা-পরিচালক ভূমি রেকর্ড অফিস এই নক্শা তৈরি করে থাকে। সারা বাংলাদেশে মোট ৮৫,৬০৮টি মৌজা আছে। মৌজা জরিপে নদী ও পাহাড়ী এলাকা বাদ দেয়া হয়।

১.১৪ মৌজা ম্যাপ তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও টেকনিক্যাল বিষয়াদি

জরিপ কর্মীরা থিউরেব্রাইন মেশিন দিয়ে প্রথমে ট্র্যাভার্স সার্ভের মাধ্যমে মৌজার পেরিফেরিটা বের করে। তারপর খাকা নামক এক ধরণের কাগজে সীটে সেটা ওঠায়। পয়েন্টগুলো সরলরেখা টেনে টেনে যোগ করে। এক চেইন = ৬৬ ফুট = ২২ গজ = ১০০ লিংক, ১ লিংক = ৬.৬২ ইঞ্চি। উত্তাপে লিংটি একটু এদিক ওদিক হলেই মাপে ভুল হবার আশঙ্কা থাকে। চেইনটি প্রতিদিন মেপে দেখতে হয় ঠিক আছে কিনা। ট্র্যাভার্স ষ্টেশনগুলির মধ্যে ২ চেইন দুরে দুরে দাগ দিতে হয়। গোল শুন্য দাগকে বলা হয় চান্দা। ভাগগুলোকে বলা হয় মোরব্বা। মোরব্বা কম্পাস দিয়ে মেপে ফিল্ড বুকে উঠানো হয়। পি-৭০ সীটে উঠিয়ে তারপর ডিভাইডার (ডিভাইডার বা কম্পাস কাটার ফোটার ভেতরে তিন মিটার জায়গা থেকে যায়, এর মীমাংসা বদর আমিন, সদর আমিন এবং চেইন ম্যান - এর হাতে থাকে। এই তাদের অলিখিত ডিসক্রেশনারী ক্ষমতা। পুরানো গাছ, আগের মাপ প্রভৃতি গ্রামের প্রবীণ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে ঝগড়ার মীমাংসা করতে হয়) দিয়ে ফিল্ড বুকে উঠানো হয়। এভাবে কিস্তোয়ার মোরব্বা করা অর্থাৎ ক্ষেত্র বানানো হয়, এরপর আইল চিহ্নিত অবস্থায় ম্যাপে উঠে যায়।

খানাপুরী হল শুন্যস্থান পূরণ বা খতিয়ানে মালিকের নাম বসানো। এই পদ্ধতিতে এক ইঞ্চি জমিও হিসাব হতে বাদ যায় না। দাগগুলির মধ্যে কে কতটুকু মালিক তা সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

১.১৫ বুজারাত ও জমিজমার বিরোধ নিস্পত্তি

নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে এ্যাটেষ্টেশন বা তাস্‌দিক করতে হয়। কানুনগো তাসদিক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে সব ঠিক থাকলে তাস্‌দিককৃত বা এ্যাটেস্টেড করে সীলমোহর দিয়ে দেন। তখন জমির মালিকানা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

১.১৬ দিয়ারা জরিপ

নতুন জেগে ওঠা চর এমনি পুরনো চরও নতুন করে জেগে উঠলে এখন আর কেউ আপনা আপনি মালিক হয় না (খাজনা চালু থাকা নদীর নীচের জমি ব্যতিরেকে)। এইসব চরাঞ্চলের দখল নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সেটেলমেন্ট অফিসার এবং তার অন্যান্য লোকবল সহযোগে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। যদি বিরোধ নিস্পত্তি স্থল দুই জেলার সীমানার মধ্যে পড়ে তাহলে উভয় জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

১.১৭ আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার

আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসার এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার এর দায়িত্ব আলাদা। দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার পয়স্তি জমি ও দরিয়ার চরে জাগা সিকস্তি জমি জরিপের দায়িত্বে থাকেন যার ভিত্তিতে নতুন জেগে ওঠা জমি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। ইউনিয়ন অফিসের পূর্বের নাম তহশীল অফিস বা কাছারী। প্রতি ইউনিয়নে একটি তহশিল করার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই এই নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। যেহেতু প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয়নি এবং কোন কোন স্থানে ২/৩ টি ইউনিয়ন - এর জন্যও একটি তহশিল অফিস আছে, সেকারণে পুরনো নামই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

১.১৮ মিস-কেস, এসএ খতিয়ান, তহশিল অফিস, আরডিসি, এসি ল্যান্ড এবং জমি সংক্রান্ত বিরোধের চূড়ান্ত মিমাংসা

মিস-কেস এর কপি আরডিসি (রেভিন্যু ডেপুটি কালেক্টর) এর অফিসে এবং জেলা রেকর্ড রুমেও থাকে। এমনকি ইউনিয়নের তহশিল অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অফিসেও থাকে। ভুল নাম কেটে শুদ্ধ নাম ঐ কাগজে উঠানো হয়। এসএ পরচাকে ঢাকার সাভার অঞ্চলে পাথাইলা পরচাও বলে । এতে কার আইল কতদুর তা ঠিক করে জমি সংক্রান্ত বিবাদের মিমাংসা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে দেখা গেছে সহকারী কমিশনার (ভূমি) - এর অফিস হতে মিস-কেস নাম তহশিল অফিসের রেজিস্টারে শুদ্ধ হলেও জেলা রেকর্ড রুমের এসএ খতিয়ানে ভুল নাম রয়ে গেছে। বিধি মোতাবেক এটি ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই এসএ খতিয়ান - এ নাম থাকলেই জমির মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া

যায় না। তহশিল অফিস, সরেজমিনে দখল এবং ১২বছরের মালিকানা বিষয়ে তথ্য নিয়ে এবং সবশেষে আরএস খতিয়ান দেখে জমি কিনতে হয়। কারণ এসএ খতিয়ানের ভুল নাম মিস কেসের পর এসএ খতিয়ানে শুদ্ধ করা না হলেও পরবর্তী আরএস (ছাপানো) খতিয়ানে শুদ্ধ হয়ে উঠে এসেছে।

১.১৯ বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত রেজিষ্টারসমূহ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা

অন্যান্য অফিসের মত স্বাভাবিক রেজিষ্টারসমূহ ছাড়াও ইউনিয়ন, থানা এবং জেলা ভূমি অফিসে আলাদা কিছু রেজিষ্টার থাকে, যেখানে নানা প্রকার পাওনা আদায়, খাস জমি প্রভৃতি সম্পর্কিয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। ১ নম্বর রেজিষ্টারের ১ নম্বর খতিয়ানে থাকে খাস জমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। জমি পয়স্তি হলে বা নদীতে চর জাগলে, নদী বা সমুদ্রে জমি পয়োবৃদ্ধি হলে বা কিনারা হতে বাড়তে থাকলে, সরকার জমি নিলামে কিনলে, কেউ জমি অনাবাদি রেখে ৫ বৎসর খাজনা না দিলে সে সম্পত্তিও পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে সরকারি বলে গন্য হবে। জনগনের ব্যবহৃত রাস্তা, খাল, ঘাট ইত্যাদিও পূর্বোক্ত খতিয়ানে থাকে। এসব থেকে প্রাপ্ত আয় অন্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ৩৬৮ মোতাবেক ৮ নম্বর রেজিষ্টারটির চারটি ভাগ আছে - ১) রাস্তা, হালট্, পানীয় জলের কূপ, বাঁধ, খালবিল, নদীনালা যা সর্বসাধারণ ব্যবহার করে এবং ৬০ বছরের অধিক সময় যাবৎ ব্যবহার করে আসছে এমন জমি ২) বন্দোবস্ত উপযোগী কৃষি ও অকৃষি জমি, ৩) নিলাম খরিদা, পরিত্যক্ত বা সরকারি জমি, ৪। পয়স্তি বা নদীতে চর জেগে ওঠা খাস জমির বিবরণ। IX নম্বর রেজিষ্টারটি নাম জারি রেজিষ্টার, এর দুটি খন্ড থাকে। ৯ নম্বর রেজিষ্টারটি সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত। এটি রোমান নম্বর দ্বারা চিহ্নিত। II নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে তলব বাকি রেজিষ্টার (অর্থাৎ কোন জমির মোট খাজনা কত, কত আদায় হয়েছে এবং কি পরিমাণ বাকি আছে) এতে ১ নম্বর অর্থাৎ খাস খতিয়ানের জমি থাকে না। III নম্বরটি খাজনা আদায় রেজিষ্টার। এই রেজিষ্টার তহশিল অফিসে থাকে। IV নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে ক্যাশ বহি যা থানা ভূমি অফিস এবং তহশিল অফিসে থাকে। V নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে ব্যাংক প্রদত্ত পাশ বহি, এটাও থানা ভূমি অফিস এবং তহশিল অফিস কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। VI নম্বর রেজিষ্টার হচ্ছে বিবিধ দাবি আদায় রেজিষ্টার (সায়রাত মহাল, পাথর মহাল প্রভৃতি পাওনা এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়) VII নম্বর রেজিষ্টারটি দৈনিক বিবিধ আদায়ের জন্য এবং VIII নম্বর বিশিষ্ট রেজিষ্টারটি হচ্ছে সরকারের দখলীয় ভূমির রেজিষ্টার।

X নং রেজিষ্টার ভূমি বন্দোবস্ত দেবার রেজিষ্টার, XI নম্বর রেজিষ্টার - খাজনা বৃদ্ধি, মওকুফ বা হ্রাস সংক্রান্ত রেজিষ্টার। এই রেজিষ্টার জেলা অফিসে সংরক্ষিত থাকে। XII নম্বর রেজিষ্টার - খাস জমি বন্দোবস্ত দেবার প্রস্তাব এর রেজিষ্টার, এটাও জেলা অফিসের রেজিষ্ট্রার। XIII নম্বর রেজিষ্টার মিস কেস এর রেজিষ্টার,

XVI রেজিষ্টার লোকাল ইনকোয়ারী রেজিষ্টার, XVII নং রেজিষ্টার ট্রেজারি চালান এর রেজিষ্টার, XXXII নম্বরটি সিকিউরিটি রেজিষ্টার, XXXIIII নম্বর রেজিষ্টারটি অফিসের স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টার এবং XXVI নম্বর রেজিষ্টারটি পরিদর্শন বহি। এছাড়া অন্যান্য রেজিষ্টারসমূহ ইংরেজি হরফে লেখা। 40 নম্বর রেজিষ্টার - এটা শুধু সিকস্তির কারণে বা খাস সম্পত্তি বন্দোবস্ত, নিলাম খরিদ, পরিত্যাক্ত ইত্যাদি কারণে ব্যবহৃত হয়। এবং ৯৪ নম্বর রেজিষ্টারটি হচ্ছে চেক বই রেজিষ্টার।

তহশিল অফিসের বিভিন্ন ধরণের রিটার্নসমূহ

১নং রিটার্ন - বাৎসরিক সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রতিবেদন (দাবি, আদায়, মিনা মওকুফ ও বকেয়া);

২নং রিটার্ন - দাবি ও আদায়ের পাক্ষিক প্রতিবেদন;

৩নং রিটার্ন - অনাদায়ী দাবির তালিকা।

১.২০ জমির স্বত্ত্ব প্রকরণ

যে সমস্ত ওয়াকফ, দেবোত্তর, ট্রাস্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা হয় নাই সে সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সরকার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন এবং এর থেকে প্রাপ্ত আয় সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না থাকলে বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করেন। পরিবারের সমস্ত সদস্যদেরকে একটি একক হিসেবে গন্য করে এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। প্রজাস্বত্ত্ব আইন স্বাধীন জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য তৈরি বৃটিশ আমল থেকে শুরু হয়ে ১৯৫০ সালে শেষ হলেও এর বিভিন্ন ধারাসমূহ ১৯৬৩ সাল থেকে কার্যকরী হয়। তখন এসএ স্বত্ত্বলিপি প্রস্তুতের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়।

উপসংহার

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যে শত্রু সম্পত্তি তৈরি করা হয় তা স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্পিত সম্পত্তি আইনে রুপান্তরিত হয়। আপাতত লীজ দেওয়া স্থগিত রেখে অর্পিত সম্পত্তি আইনে বিষয়টির মিমাংসা চলতে থাকে। এর সাথে জড়িত আছে স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র শক্তির সহযোগিতার বিষয় অন্যদিকে জড়িত আছে দেশের জনগণের ইচ্ছা, তাদের স্বার্থ ও শান্তি রক্ষার প্রশ্ন। অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের পর কি ব্যবস্থায় এ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা হবে তা এখনো অনেকটা অস্পষ্ট। পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তা বিবেচিত হবে না অন্য দেশের নাগরিকদের ডেকে এনে তাদের পূর্ব সম্পত্তিতে বহাল করা হবে নাকি অন্য কোনো ব্যবস্থায় সেই সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের নিকট পরিত্যক্ত সম্পত্তির মত সরকারের তত্ত্বাবধানে বিক্রয় করা হবে তা এখনো অনিশ্চিত বিধায় এই সম্পর্কে জনগণের মনে বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। এসমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে এবং দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির কথা ভেবেই এ ধরণের জটিল বিষয়ের সমাধান দিতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ, এমাজউদ্দিন (সম্পাঃ), ভূমিসংস্কার (১৯৯২), বুক সোসাইটি, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মিয়া, মোঃ আবদুল কাদের, ম্যানুয়াল, (১৯৯২), ঢাকা।

মিয়া, মোঃ আবদুল কাদের, ভূমি জরীপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, (১৯৯২), ঢাকা।

হক, মোঃ সামশুল, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, (১৩৯৬) বই ঘর, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ প্রক্রিয়া

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

ভূমিকা

বাংলাদেশে থানা পর্যায়ে আধুনিক ধাঁচের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ খুব বেশী দিন আগে হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বেশ কিছু পরে ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) (তৃতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ জারীর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। এই উপজেলা পরিষদ আইন মূলত থানা বা উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি উদ্যোগ। উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরে প্রথমে যদিও থানা নির্বাহী অফিসার (পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার) এর মাধ্যমে থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হতো, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে থানা বা উপজেলার সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে জনপ্রতিনিধিকে অধিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফলে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে মোট ২(দুই) বার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সরাসরিভাবে জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল (স্থগিত) করে দেয়া হয়। ফলে ২য় দফায় নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ তাদের কার্যকাল সম্পূর্ণ করতে পারেননি। উপজেলা প্রশাসনের যে গতিশীলতা এসেছিল উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাতিল আদেশ জারীর কারণে তা স্তিমিত হয়ে যায়। তবে উপজেলা পর্যায়ে যে সমস্ত অফিস বা সরকারী দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। তাছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল কমিয়ে দেয়া হলেও তা একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়নি। উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই, গ্রহন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যানগণকে তাদের নামের ক্রমানুসারে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে একটি সভা করার জন্য আদেশ জারী করা হয়। এ ব্যবস্থার ফলে থানা পরিষদ তার কার্যক্রম মোটামুটিভাবে অব্যাহত রাখে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরনার্থে

---

*উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তারিখে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন বিভিন্ন পেশার ও শ্রেণীর জনগনের সাথে আলাপ আলোচনা এবং বৈঠকের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার সমূহের গঠন, নির্বাচন প্রক্রিয়া, স্থানীয় সরকার সমূহের ক্ষমতা, কার্য পরিধি ইত্যাদির সম্ভাব্য রূপরেখা সম্বন্ধে তাদের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রনয়ন করে এবং উক্ত প্রতিবেদনের আলোকেই মূলত স্থানীয় সরকার সমূহের রুপরেখা সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে তা আইন আকারে পাশ করা হয়। স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৮ সনের ৩রা ডিসেম্বর উপজেলা পরিষদ আইন গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। উক্ত আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে থানা পরিষদ সমূহ পুনরায় উপজেলা পরিষদ নামে অভিহিত হয়। তবে রাজনৈতিক বিরোধের কারণে এবং বিরোধী দলসমূহের অব্যাহত বিরোধীতা এবং অসহযোগিতার কারণে মূলত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদের জন্য সরাসরি জনগনের ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে উপজেলা পরিষদ আইন পাস হওয়া সত্বেও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাঙ্খিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাজ পরিচালনা করতে পারছে না। তবে আগের মতই উপজেলা এলাকাধীন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগনের পর্যায়ক্রমিক সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নসহ সমুদয় কার্যক্রম আপাতত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালীভাবে বিকশিতকরণ প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

স্থানীয় সরকার কি ?

বাংলাদেশে থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনার আগে "স্থানীয় সরকার" বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে ধারনা নেয়া প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা যা স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে তাকে সাধারণত স্থানীয় সরকার বলা হয়। স্থানীয় সরকারের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকায় স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্য পরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা বিভিন্ন আইন, বিধি, সার্কুলারের মাধ্যমে জাতীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাত্ত্বিকগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা ও ক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪০ এর দশকে জি মন্টাগো মরিস স্থানীয় সরকার এর দু'ধরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রথমত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্বাবলী পায়। এসব প্রতিষ্ঠান উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে তবুও পদ্ধতি দু'টি মোটামুটি পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে।

চার্লস ব্যরই বলেছেন, স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়; যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে। যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে তবুও তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন থেকে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এনসাইক্লোপেডিয়া অব স্যোশ্যাল সায়েন্সের নয় ও দশ নম্বর ভলিউমে উইলিয়াম এ রফসন স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন "স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার ও সংগঠন আছে"। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রে রাজনৈতিক উপবিভাগ, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে।"

এ আলোচনায় স্থানীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাতঃ

(১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন;

(২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা;

(৩) স্থানীয় সরকার ব্যব্বস্থা হলো কর ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংগঠন যার নিজস্ব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে;

(৪) এ সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ।

আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থানা পর্যায়ের খুব বেশীদিন আগে গঠিত না হলেও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও দালিলাদী বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বর্তমানের বাংলাদেশ অঞ্চলে গ্রামীন বা স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বহুকাল আগেই বিকশিত হয়েছে। বৈদিক যুগে অর্থাৎ ১৫০০ - ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে গ্রাম পরিষদ বা গ্রামীন কাউন্সিল নামে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল ছিল বলে তৎকালীন ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠে জানা যায়। সে সময় সভা

ও মহাসভা নামে পরিচিত এসব কাউন্সিল গ্রামীন পর্যায়ের প্রশাসন ও অর্থনীতি বিষয়ক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তদারকী করতো। সভাগুলি মূলত শুধু একটি কাউন্সিলই ছিল না, বরং তা ছিল তৎকালীন গ্রামীন জনসাধারনের মিলন কেন্দ্র। গুপ্ত যুগে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিকভাবে বেশ কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করে শাসন ব্যবস্থা যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়। বুক্তি (Bhukti), বিশ্ব, মন্ডল, বিথি এবং গ্রাম নামে পরিচিত এসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পর্যায়ক্রমিকভাবে বা স্তরক্রমিকভাবে সমগ্র প্রশাসন পরিচালনা করতো। আয়তনের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এসব প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানের বিভাগ, জেলা, মহকুমা বা উপজেলা ও গ্রামের সাথে তুলনা করা যায়। গুপ্ত আমলে জমি ক্রয় ও বিক্রয় প্রক্রিয়া এসব স্থানীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। পাল এবং সেন বংশের শাসনকালে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তারা স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন আনেনি। আসলে প্রাচীনকালে যে গ্রামীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ গোত্রভিত্তিক বা বর্নভিত্তিক। বিশেষ কোন ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বা কৃষকের সাথে বৃহত্তর বিবাদ মিটানোর জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো বলে কোন কোন বর্ননায় এসেছে।

মোগল আমলে এই অঞ্চলকে 'বাংলা' নামে অভিহিত করে তাদের শাসনকে বাংলার উপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একে তাদের সাম্রাজ্যের অংশে পরিনত করা হয়। সে সময়ে বাংলা একটি প্রদেশের মর্যাদালাভ করে যা কিনা 'সুবা' নামে পরিচিতি পায়। সুবার শাসককে সুবাদার বলা হতো। সুবা আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। আর এই বিভক্তির অংশগুলি সরকার নামে পরিচিত ছিল। সরকারের প্রশাসককে ফৌজদার বলা হতো। আর সরকার সমূহ আবার কয়েকটি পরগনা নিয়ে গঠিত হতো যা সিকদারগনের তত্বাবধানে পরিচালিত হতো। সেই সময় প্রশাসন ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা কিনা থানাদার দ্বারা পরিচালিত হতো, যার দায়িত্বে চৌকিদার থাকতেন। মহল্লার প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করতেন মোহাল্লিক বা মল্লিকগন। তবে মুঘল শাসকগন যেহেতু এলাকা সম্বন্ধে তেমন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না সেজন্য তারা সর্বনিম্নস্তরের অর্থাৎ গ্রামীন পর্যায়ের প্রশাসনে তেমন কোন পরিবর্তন আনেননি। তারা পূর্বের প্রচলিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কোনরুপ পরিবর্তন আনয়ন না করে গ্রামীন প্রধান বা 'হেডম্যান' এর উপরে গ্রামীন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বভার রেখে দেন। এই হেডম্যান গ্রাম পরিষদ বা পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। তিনি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের খাজনা আদায় করতেন এবং তা সরকারী কোষাগারে জমা দিতেন। এই গ্রাম প্রধানের সরাসরি তত্বাবধানে একজন হিসাব সহকারী ছিলেন যাকে পাটোয়ারী বলা হতো। তিনি গ্রামের সমস্ত ধরনের রাজস্ব আদায়ের এবং শস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার হিসাব সংরক্ষণ করতেন। এই

পঞ্চায়েত গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেখাশোনা করতো। গ্রামে বসবাসকারী জনসাধারনের ধর্মীয় এবং নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে দেখাশোনা করার জন্য এই পঞ্চায়েতের উপরে দায়িত্ব দেয়া হয়। আসলে সে সময় গ্রামগুলি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মৌলিক ইউনিটে পরিনত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মোগল আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত থাকায় থানা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রথমবারের মতো বিকশিত হয়। এর প্রশাসককে কতোয়াল বলা হতো। আর প্রতিটি মহল্লা তথা আজকের ওয়ার্ডের জন্য মীর মহল্লাহ নিযুক্ত হতেন। শহর এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য কাজী নিয়োগ করা হত। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রতিটি শহরে একটি করে বিশ্রামাগার বা খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করা হত।

ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ আমলে। স্থানীয় পর্যায়ে স্বশ্বাসিত শাসন ব্যবস্থা এবং শাসন প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃটিশরা বেশকিছু আইন প্রনয়ন করে বলে তারা দাবী করে। এসব আইনের মধ্যে গ্রাম চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন - ১৮৭১, বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট - ১৮৮৫ এবং দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট ১৯১৯ - গ্রামীন স্থানীয় সরকার সমূহের প্রতিষ্ঠানিক বিকাশে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রেখেছে বলে দাবী করা হয়। যদিও দাবী করা হয় যে, এসব বিধিবিধান প্রনীত হওয়ার ফলে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এসব আইন প্রণয়নের দ্বারা গ্রামীন জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বলে প্রমান পাওয়া যায়না। আসলে বৃটিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সারা দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার তাগিদেই এসব আইন প্রনয়ন করেছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে তাদের মুল লক্ষ্য ছিল যেহেতু সমাজে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সেহেতু তাদের প্রথম আইনটিই ছিল মূলতঃ পুলিশী শক্তিকে গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার (গ্রামে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন - ১৮৭০) লক্ষ্যে গ্রাম পুলিশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন। আসলে বৃটিশদের প্রনীত এসব আইনে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কল্যানের লক্ষ্যে তাদের অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কোন উদ্যোগ বা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এই প্রবন্ধটি যেহেতু থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে সেহেতু বৃটিশ আমলে প্রনীত এসব আইনগুলির মাধ্যমে থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিরুপ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে তা আলোচনার প্রয়াস নেয়া হল।

গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭০

লর্ড মেয়ো এর আমলে গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭০ সালে পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৫ জন সদস্য মনোনীত হয়ে পঞ্চায়েত গঠন করতেন। আসলে কয়েকটি গ্রাম এলাকা নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হতো। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এই আইনটি ছিল মূলতঃ গ্রাম ভিত্তিক। অর্থাৎ আজকের ইউনিয়ন পরিষদ এর সাথে তৎকালীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যথেষ্ঠ মিল পাওয়া যায়। থানা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশে এই আইন তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন - ১৮৮৫

এই আইনে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালুর বিধান করা হয়েছিল। এ স্তরগুলি হলোঃ

(ক) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি (এর পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল)।

(খ) মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড।

(গ) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড।

এই আইন অনুযায়ী আপাতঃদৃষ্টিতে থানা পর্যায়ে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা না হলেও বাস্তবে লোকাল বোর্ড থানা পর্যায়ের স্থানীয় শাসন বিকাশে ভূমিকা পালন করতো। একটি লোকাল বোর্ড কমপক্ষে ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো যার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হতেন। এই দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অবশ্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর এর অনুমোদন সাপেক্ষে নিযুক্ত হতেন। লোকাল বোর্ড এর অধীনস্থ ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে নিয়ন্ত্রন করাই ছিল লোকাল বোর্ডের অন্যতম কাজ। এই আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের উপর অত্যধিক ক্ষমতা অর্পন করার ফলে লোকাল বোর্ড জেলাবোর্ডের উপরে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে লোকাল বোর্ড স্বাধীনভাবে একটি যোগ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রুপে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু জেলা বোর্ডের নিজেরই আয়ের উৎস যেহেতু সীমাবদ্ধ ছিল সেহেতু লোকাল বোর্ডকে তেমন আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারতো না।

বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯

এই আইন অনুযায়ী অধিকতর স্বাধীন ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক লোকাল বোর্ড গঠনের বিধান করা হয়। এই আইনের বিধান অনুযায়ী মনোনীত এবং নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে লোকাল বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইউনিয়ন বোর্ড এবং

জেলা বোর্ডের মধ্যে সেতু-বন্ধন রক্ষাকারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে লোকাল বোর্ড যাতে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়েছিল। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা কমানো এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় বা আর্থিক দিক থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তেমন একটা ছিল না বলে এই আইনও থানা পর্যায়ে স্বাধীন ও কাঙ্খিত মাত্রায় সক্রিয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

উপরে বর্নিত আইনগুলির আলোকে বিশ্লেষন করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বৃটিশ আমলে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার সমূহের কাঠামোগত বিকাশ হয়নি। ফলে সেই সময় থানা সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারনা ছিল খারাপ। আর বৃটিশ শাসকবর্গ এই ধারনা আরও প্রকট করে তোলে। সে সময় থানাকে সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে উপস্থিতির একটি ঠিকানা (Out post) মনে করা হতো। তখন থানাকে আসলে বৃটিশ শাসন ও শোষন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার মনে করা হয়েছে। অন্য কথায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ার হিসাবে থানাকে বৃটিশ শাসকরা ব্যবহার করেছেন। জনগনের কাছে থেকে খাজনা আদায় এবং তাদেরকে প্রয়োজনে উৎপীড়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে বৃটিশরা থানাকে ব্যবহার করেছে। এজন্য থানা পর্যায়ে কোন স্থানীয় সরকার যথাযথভাবে বা শক্তিশালীভাবে বিকাশের ক্ষেত্রে বৃটিশরা তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। তৎকালীন ভারতবর্ষে স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকারের অভাব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৮৮০ সালে ফেমিন কমিশনের প্রতিবেদনে যথার্থই এই অভাবের কথা ফুটে উঠেছিল। এই কমিশন স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষতঃ থানা পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকশিত করার সুপারিশ করে।

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারত বর্ষকে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি দেশে বিভক্ত করে। ভারত বিভক্তির সময় সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত হয়। সে সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গনতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এমন সময় প্রখ্যাত সমাজ সেবক ডঃ আখতার হামিদ খান "কুমিল্লা মডেলের" প্রচার শুরু করেন। তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সমাজের সুষম উন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার করার মাধ্যমে গনতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠনিক ভিত্তি জোরদার করার পথ প্রদর্শন করেন। ডঃ আখতার হামিদ খানের মডেলের ভিত্তিতে তৎকালীন শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান মৌলিক গনতন্ত্র আদেশ - ১৯৫৯ জারী করেন। এই আদেশ বলে দেশে ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এগুলো হলোঃ

১। ইউনিয়ন কাউন্সিল।

২। থানা কাউন্সিল।
৩। জেলা কাউন্সিল।
৪। বিভাগীয় কাউন্সিল।

এই আদেশ প্রবর্তনের মাধ্যমে থানা পর্যায়ে ব্যাপক ও যুগান্তরকারী পরিবর্তান সাধিত হয়েছিল। যে থানাকে বৃটিশ আমলে জনগনকে শাসন করার হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়েছিল, যে থানা ছিল শাসকবর্গের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অস্ত্র স্বরুপ, সেই থানাই কিন্তু কুমিল্লা মডেলের বদৌলতে থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভালাপমেন্ট সেন্টার (অর্থাৎ টিটিডিসি) এ পরিনত হয়। অর্থাৎ থানা শুধুমাত্র প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য সরকারী শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রনের কেন্দ্রতেই পরিনত হয়নি বরং থানা সে সময়ে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুতিকাগারে পরিনত হয়। থানা পর্যায়ে কর্মরত কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, সমবায় বিভাগসহ সকল জাতিগঠনমূলক বিভাগের কর্মকান্ড এই টিটিডিসি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। তখন প্রতিটি থানাতে একটি করে টিটিডিসি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি থানা এলাকার অন্তর্ভূক্ত সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সদস্য হতেন। আর থানা পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের সাথে টিটিডিসি ভবনে মিলিত হয়ে সব ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুন্দরভাবে শাসককার্য পরিচালনার জন্য সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন। সমন্বিতভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিএডিসি আধুনিক পদ্ধতির সেচ যন্ত্রের বড় বড় মেশিন ডিপো স্থাপন করেছিল যেখানে জ্বালানী তেলের বড় ধরনের সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হয়। আধুনিক কৃষকরা যাতে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সুচনা করতে পারেন সেজন্য টিটিডিসির মাধ্যমে সমন্বিত প্রচেষ্টার ও সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদসহ সব ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এজন্য টিটিডিসি ভবনের মধ্যে সমবায় কর্মকান্ড পরিচালনাকারী সমিতিসমূহের সমন্বয়কারী অফিস বা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। খুব সম্ভবতঃ কুমিল্লা মডেলের মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায়ে এমন শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগে নেয়া হয়েছিল যেখানে জনসাধারনের সামগ্রিক কল্যানের লক্ষ্যে সব ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টা সমবায় পদ্ধতিতে এবং সমন্বিতভাবে গ্রহণের একটি ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার দ্বারা বাস্তবিক অর্থে সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হতো। একটি থানায় বসবাসকারী জনসাধারণকে টিটিডিসি নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতায় এনে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হতো, জনসাধারনকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার জন্যই এটা করা হতো। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের বিকাশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যতো ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ অদ্যাবধি গ্রহন করা হয়েছে তার মধ্যে কুমিল্লা মডেলের মূল বিষয় অর্থাৎ থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার (টিটিডিসি) ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বা উন্নত। কারণ থানা

২। থানা কাউন্সিল।
৩। জেলা কাউন্সিল।
৪। বিভাগীয় কাউন্সিল।

এই আদেশ প্রবর্তনের মাধ্যমে থানা পর্যায়ে ব্যাপক ও যুগান্তরকারী পরিবর্তান সাধিত হয়েছিল। যে থানাকে বৃটিশ আমলে জনগনকে শাসন করার হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়েছিল, যে থানা ছিল শাসকবর্গের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অস্ত্র স্বরুপ, সেই থানাই কিন্তু কুমিল্লা মডেলের বদৌলতে থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভালাপমেন্ট সেন্টার (অর্থাৎ টিটিডিসি) এ পরিনত হয়। অর্থাৎ থানা শুধুমাত্র প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য সরকারী শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রনের কেন্দ্রতেই পরিনত হয়নি বরং থানা সে সময়ে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুতিকাগারে পরিনত হয়। থানা পর্যায়ে কর্মরত কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, সমবায় বিভাগসহ সকল জাতিগঠনমূলক বিভাগের কর্মকান্ড এই টিটিডিসি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। তখন প্রতিটি থানাতে একটি করে টিটিডিসি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি থানা এলাকার অন্তর্ভূক্ত সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সদস্য হতেন। আর থানা পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের সাথে টিটিডিসি ভবনে মিলিত হয়ে সব ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুন্দরভাবে শাসককার্য পরিচালনার জন্য সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন। সমন্বিতভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিএডিসি আধুনিক পদ্ধতির সেচ যন্ত্রের বড় বড় মেশিন ডিপো স্থাপন করেছিল যেখানে জ্বালানী তেলের বড় ধরনের সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হয়। আধুনিক কৃষকরা যাতে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সুচনা করতে পারেন সেজন্য টিটিডিসির মাধ্যমে সমন্বিত প্রচেষ্টার ও সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদসহ সব ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এজন্য টিটিডিসি ভবনের মধ্যে সমবায় কর্মকান্ড পরিচালনাকারী সমিতিসমূহের সমন্বয়কারী অফিস বা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। খুব সম্ভবতঃ কুমিল্লা মডেলের মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায়ে এমন শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগে নেয়া হয়েছিল যেখানে জনসাধারনের সামগ্রিক কল্যানের লক্ষ্যে সব ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টা সমবায় পদ্ধতিতে এবং সমন্বিতভাবে গ্রহণের একটি ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার দ্বারা বাস্তবিক অর্থে সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হতো। একটি থানায় বসবাসকারী জনসাধারণকে টিটিডিসি নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতায় এনে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হতো, জনসাধারনকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার জন্যই এটা করা হতো। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের বিকাশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যতো ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ অদ্যাবধি গ্রহন করা হয়েছে তার মধ্যে কুমিল্লা মডেলের মূল বিষয় অর্থাৎ থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার (টিটিডিসি) ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বা উন্নত। কারণ থানা

পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের ক্ষেত্রে টিটিডিসি আজও আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করছে।

এতো কিছুর পরেও এ ব্যবস্থা বেশ কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ সময় এসডিও থানার সবচেয়ে বড় কর্তা অর্থাৎ টিটিডিসির চেয়ারম্যানের ভূমিকায় ছিলেন। আর থানায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতো। ব্যাপক হারে সরকারী অনুদান সে সময় বরাদ্দ করা হতো। কিন্তু গ্রাম্য জনসাধারনের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। তখন ব্যাপকহারে অর্থ ব্যয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জনসাধারনের ভাগ্যোন্নয়ন তেমন হয়নি গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিকাশ না ঘটায়। আসলে থানা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সে সময় মূলতঃ সমন্বয়কারীর ভূমিকাতেই থেকে যায়। এদিক বিবেচনায় এনে অনুমান করে বলা যায় যে, সে সময় সরকার থানা পর্যায়ে স্বাধীন ও শ্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশে তেমন আগ্রহী ছিল না। আসলে এ পদক্ষেপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসাবে সরকারী কর্মকর্তার নিয়োগদান এবং বেশীর ভাগ সদস্যই সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্য হতে মনোনীত হওয়ায় শ্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশের ধারা ব্যহত হয়। বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব তখন শ্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। মৌলিক গনতন্ত্রের কেন্দ্রভূমি হিসাব বিবেচিত এই টিটিডিসি ধনী, জোতদার, মহাজন ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংরক্ষনের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। এতদ্‌সঙ্গেও এলিয়ট টেপার এই ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিক বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসাবে মনে করেন।

বাংলাদেশ আমল

বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কার্যকারিতা আনয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু আইন প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু তখন সংবিধান প্রনীত না হওয়ায় এবং পার্লামেন্ট বা আইন প্রনয়নকারী সংস্থা কার্যকর না থাকায় রাষ্ট্রপতির আদেশ জারীর মাধ্যমে (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং - ৭) পূর্বের প্রচলিত মৌলিক গনতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট থানা কাউন্সিলকে ভেঙ্গে দিয়ে থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। আর এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে থানা কাউন্সিলের নাম থানা পরিষদ করা হয়। থানা পরিষদ সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী সদস্যের সমন্বয়ে গঠনের বিধান রাখা হয়। মহকুমা প্রশাসককে থানা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কে থানা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়ুক্তির বিধান রাখা হয়।

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৭৬ মোতাবেক থানা পরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করতোঃ

১। ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলির কর্মাকান্ডে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতাকরন।

২। থানা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩। থানা পরিষদ এলাকার মধ্যে কর্মরত সকল অফিস সমূহের কর্মকান্ডের তদারকী ও সমন্বয় সাধন।

তবে পাকিস্তানী আমলের মতো থানা পরিষদের সুনির্দিষ্ট ও স্বাধীন কোন আয়ের উৎস ছিল না। ফলে এই সময় থানা পরিষদ যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ সংস্থানের জন্য সরকারের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

থানা পরিষদ কার্যকরী থাকার পাশাপাশি থানা উন্নয়ন কমিটি নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্য হিসাবে কাজ করতেন। থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী ও একজন ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হতো। বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের সাধারণ দায়িত্ব এই কমিটি পালন করতো।

তাত্বিকভাবে যতকিছু বলা হোক না কেন, বাস্তবিক অর্থে থানা পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের এবং সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে এ সময় তেমন কোন শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেনি। ফলে থানা পরিষদ তার প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে তেমন কোন সার্থকতা দেখাতে পারেনি।

স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২

বাস্তবিক অর্থে থানা পর্যায়ে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার গঠনের দৃঢ়ভিত্তিক এবং বৃহদাকার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ - ১৯৮২ এর দ্বারা। এ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে প্রথমে থানাকে উন্নীত থানা পরিষদ হিসাবে নামকরন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে মোট ৪৫টি থানাকে উন্নীত থানায় রুপান্তরিত করা হয়। পর্যায়ক্রমিকভাবে মোট ৪৬০টি থানাকে উন্নীত থানায় রুপান্তরিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৮২ জারীর মাধ্যমে উন্নীত থানা পরিষদ সমূহকে উপজেলা পরিষদ হিসাবে পূনঃ নামকরণ করা হয়। তারপর প্রায় একদশক উপজেলা পদ্ধতি কাজ করে। ১৯৯১ সনে উপজেলা পদ্ধতি স্থগিত করা হয় সে সময় উপজেলা পরিষদের নাম থানা পরিষদ করা হয়। থানা

পরিষদসমূহে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ (ADP খাতে) কমিয়ে দেয়া হয়। তবে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের বরাদ্দ ও কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এ সময় থানা নির্বাহী অফিসারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থানা প্রশাসন পরিচালিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নামের বাংলা অক্ষরের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমিকভাবে ইউপি চেয়ারম্যানকে উপজেলা পরিষদের মাসিক উন্নয়ন সভায় (যে সভায় মূলতঃ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহন, অনুমোদন ও প্রকল্পের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো) সভাপতিত্ব করার বিধান প্রবর্তিত হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ অবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগন উপজেলায় কাজ করতেন ঠিকই কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের কারও নিকট তারা দায়বদ্ধ ছিলেন না। ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা তেমন ছিল না। জনগনের ত্যাগের মাধ্যমে বা ঋনের বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে যে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হতো তা প্রকৃত প্রস্তাবে জনকল্যানে ব্যয় হয়নি বলে ধরে নেয়ার সঙ্গত কারন রয়েছে। যাহোক বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা (নির্বাচনী মেনিফেষ্টো) অনুযায়ী গত ০৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৮ই তারিখে উপজেলা পরিষদ আইন গেজেটে প্রকাশ পায়। এ আইন প্রকাশের ফলে উপজেলা পদ্ধতি আবারও প্রানচাঞ্চল্য পাবে এবং উপজেলা পর্যায়ে গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বলে আশা করা যায়।

আসলে উন্নয়নের সুফলকে জনগনের দোরগোড়ায় পৌছে দেবার লক্ষ্যে সময় ও দেশের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে উপজেলা প্রশাসনকে জনসাধারনের নিকট গ্রহনযোগ্য ও জনকল্যাণমূলক করে গড়ে তোলার জন্য বিকেন্দ্রীকরন করার পক্ষের প্রবক্তাগন মত প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন থানা পরিষদসমূহকে উপজেলা পরিষদে উন্নীতকরনের ফলে থানাগুলি অর্থাৎ উপজেলাসমূহ স্থানীয়ভাবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয়েছে। উপজেলার প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। উপজেলার প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ চেয়ারম্যান জনগনের দ্বারা সরাসরিভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব। চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে গঠিত উপজেলা পরিষদ উপজেলা এলাকার মধ্যে সব রকম উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহনসহ জনগনের ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাবে। এ পরিষদ এলাকার জন্য লাগসই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করবে। তাছাড়া কেন্দ্রের প্রতি নির্ভরশীলতা কমার ফলে ত্বরিৎগতিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে জনগনের ব্যাপক উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

উপজেলা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়া

এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরুপঃ

(ক) একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান।

(খ) জনপ্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ।
(গ) তিনজন মহিলা সদস্য।
(ঘ) সরকারী প্রতিনিধি সদস্যবর্গ।
(ঙ) থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিরি চেয়ারম্যান এবং
(চ) একজন মনোনীত সদস্য।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন, যিনি উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ উদ্বৃত বিধিবিধান ও পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হবেন।

তবে শর্ত থাকে যে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তার পদে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই অধ্যাদেশের আওতায় উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগন উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি/সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। তারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের পরেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য প্রতিনিধি সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। অফিসিয়াল সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগ তথা চেয়ারম্যান অপসরনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। জনপ্রতিনিধি সদস্যদের ক্ষমতার পাশাপাশি দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন, গ্রামীন জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

প্রতিটি উপজেলা পরিষদের জন্য ৩ জন করে মহিলা সদস্য থাকবেন যারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। আর মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে হতে মনোনীত করতে হবে।

উপজেলা পরিষদে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগন সরকারী সদস্য হিসেবে মনোনীত হবেন, যাদের কোন ভোট প্রদানের অধিকার থাকবে না। এ ছাড়াও সরকার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করতে পারবেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিসিয়াল মেয়াদ

কোন যোগ্য ব্যক্তি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তার অফিসে অধিষ্ঠিত হয়ে শপথ গ্রহনের দিন থেকে ৫ বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত উপজেলা

পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে পরবর্তী চেয়ারম্যান অফিসে আসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার দায়িত্বভার অব্যাহত রাখবেন, যদিও তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

১। একজন ব্যক্তি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, যদি -

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন।

(খ) তাঁর বয়স ২৫ বছর হয়।

(গ) তাঁর নাম উপজেলার ভোটার তালিকায় থাকে।

২। একজন ব্যক্তি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বা চেয়ারম্যান হওয়ার অযোগ্য হবেন, যদি -

(ক) কোন যোগ্য আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা করেন।

(খ) তিনি দেউলিয়া হন।

(গ) তাঁর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব না থাকে অথবা তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ বা আনুগত্য ঘোষনা বা স্বীকার করেন।

(ঘ) তিনি ফৌজদারী অপরাধে দুই বছরের কম নয় এমন মেয়াদে দন্ডিত হয়ে থাকেন, তাহলে দন্ডভোগ শেষ হওয়ার পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত।

(ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংশ্লিষ্ট পরিষদের অথবা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষের বেতনভোগী সার্বক্ষনিক কর্মচারী হয়ে থাকেন।

(চ) তিনি কোন কাজ বা মালপত্র সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের সাথে চুক্তিতে এসে থাকেন অথবা এর আর্থিক ব্যাপারে তার কোন স্বার্থ থাকে অথবা তিনি জরুরী পণ্য সরবরাহের জন্য সরকার নিয়োজিত ডিলার হয়ে থাকেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান অন্য কোন পরিষদের বা পৌরসভার পদে থাকবেন না। চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর যে দিন থেকে তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন সেদিন থেকে কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার অন্যকোন পদে তিনি কর্মরত থাকতে পারবেন না।

চেয়ারম্যানের শপথ

প্রত্যেক চেয়ারম্যান তার কার্যকালের দায়িত্ব গ্রহনের আগে সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে অর্ডিন্যান্স এর বর্ণনা মোতাবেক শপথ গ্রহণ করবেন। তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক চেয়ারম্যান বাংলাদেশের ভেতরে কিংবা বাহিরে অবস্থিত তার বা তার পরিবারের কোন সদস্যের মালিকানাধীন অথবা তাঁর অধিকারে

কিংবা তাঁর নিয়ন্ত্রনে থাকা সমুদয় সম্পত্তি অর্থাৎ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ লিখিতাকারে জানাবেন।

চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হওয়া

(ক) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হবে যদি তিনি চেয়ারম্যান হওয়ার অযোগ্য হয়ে থাকেন।

(খ) নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে গেজেটে নাম বিজ্ঞাপিত হওয়ার পরে ৩০ দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণে ব্যর্থ হলে।

(গ) চেয়ারম্যান তার পদে ইস্তফা দিলে।

(ঘ) চেয়ারম্যান তার পদ থেকে অপসারিত হলে।

(ঙ) তাঁর মৃত্যু হলে।

অস্থায়ী চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান পদ কোন সময় শুন্য হলে অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারনে চেয়ারম্যান তার দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে নয়া চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহনের পূর্ব পর্যন্ত অস্থায়ী চেয়ারম্যান কাজ করবেন।

পরিষদের উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীনে একক আঞ্চলিক এলাকা হতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হবেন। উপজেলা পরিষদ মাননীয় সংসদ সদস্য অর্থাৎ পরিষদের উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবে।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীসমূহ

উপজেলা পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যাবলীসমূহ সম্পাদন করবেঃ

(১) জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

(২) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকী ও উহাতে সহায়তা প্রদান।

(৪) মহিলা, শিশু, সমাজকল্যান এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন করা।

(৫) নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(৬) সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(৭) থানা পর্যায়ের সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ইত্যাদি।
(৮) ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন।
(৯) ইউনিয়ন পরিষদের কাজ কর্মের সহায়তা ও উৎসাহ দান।
(১০) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যান কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া।
(১১) পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ।
(১২) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষন প্রদান।
(১৩) উপজেলার সরকারী নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
(১৪) ডেপুটেশনের অধীন হস্তান্তরিত বিষয়ের কর্মকর্তাদের কর্মরত কাজের তদারক, নিয়ন্ত্রন ও সমন্বয় সাধন।
(১৫) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করা।
(১৬) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।
(১৭) উপজেলায় সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণ ও বিকাশ।
(১৮) উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেলা পরিষদকে সহায়তা করা।
(১৯) সকল পল্লী পূর্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
(২০) উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রম জোরদার করা।
(২১) শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের বিকাশ।
(২২) গবাদি পশু, মৎস্য চাষ ও বন সম্পদ উন্নয়ন।
(২৩) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বিপুল কার্যক্রম যাতে সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদিত হতে পারে সে জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রনমূলক কার্যাবলী ব্যতীত উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সবগুলো উন্নয়নমূলক কার্যাবলী উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়েছে। এগুলো হলঃ

(১) কৃষি (সম্প্রসারণ), সেবা, উপকরন সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থা।
(২) প্রাথমিক শিক্ষা।
(৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এমসিএইচ), সকল ধরনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রমূলক সেবা।
(৪) পল্লী পানি সরবরাহ এবং সেনিটেশন ব্যবস্থা বিষয়ক কর্মসূচী।
(৫) পল্লী পূর্ত কর্মসূচী।
(৬) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী।
(৭) প্রাকৃতিক দূর্যোগ সময়ে ত্রান কর্মসূচী।
(৮) সমবায় এবং সমবায় ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম।
(৯) মৎস্য উন্নয়ন।
(১০) গবাদিপশু উন্নয়ন।

উপরোক্ত হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ দ্বারা উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে জাতীয় দৃষ্টিকোন হতে গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকা দরকার এরুপ কার্যাবলী সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে সংরক্ষিত হিসাবে রাখা হয়। সংরক্ষিত বিষয়সমূহ হলোঃ

(১) দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার।
(২) আয়কর, আবগারী, আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক, ভূমিকর বা ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি কেন্দ্রীয় রাজস্ব সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।
(৩) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা।
(৪) রেজিষ্ট্রেশন।
(৫) খাদ্য শস্যের মত জরুরী দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা।
(৬) বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বিতরণ।
(৭) আন্তঃজেলা সংযোগকারী সেচ প্রকল্প।
(৮) কারিগরী শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা, যেমন কৃষি, কারিগরী, মেডিকেল শিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।
(৯) আধুনিক জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন হাসাতাল।
(১০) বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
(১১) বহদায়তন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও দুগ্ধখামার।
(১২) বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান।
(১৩) আন্তঃজেলা এবং আন্তঃ উপজেলা যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ, যেমন ডাক, তার, টেলিফোন, রেলওয়ে, যন্ত্রচালিত স্থল ও জলযান।
(১৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন।
(১৫) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ।
(১৬) খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও উন্নয়ন।
(১৭) জাতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ।

উপজেলা পরিষদের তহবিল গঠন

প্রতিটি উপজেলা পরিষদের একটি তহবিল গঠিত হবে, যার নাম হবে উপজেলা পরিষদ তহবিল। আর এই তহবিলে যে সব অর্থ আসবে তা হলঃ

(ক) বর্তমান আইনের অধীনে পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, খাজনা তোলা, ফি ও অন্যান্য চার্জ;
(খ) পরিষদের কাছে অর্পিত বা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তির খাজনা বা লাভ,
(গ) বর্তমান আইনের বা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে সম্পাদিত কাজের মাধ্যমে পরিষদের পাওয়া অর্থ,

(ঘ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থ,
(ঙ) পরিষদের ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত ট্রাষ্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ,
(চ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুদান,
(ছ) বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সকল লাভ, এবং
(জ) সরকার কর্তৃক পরিষদের অধীনে অর্জিত হতে পারে এমন সকল সুত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

উপজেলা পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠনঃ

(১) পরিষদ তহবিলের অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কাজ করে এমন কোন ব্যাংক বা সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারিত ব্যবস্থায় থাকবে।
(২) নির্দেশ মোতাবেক পরিষদ তহবিলের কোন অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে।
(৩) সরকারের প্রয়োজন মোতাবেক পরিষদ বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি পৃথক তহবিল গঠন ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং নির্দেশ মোতাবেক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করবে।

পরিষদের তহবিল ব্যবহার

পরিষদের তহবিল নিম্নোক্ত ভাবে বর্নিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা হবে।
প্রথমতঃ পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতা দান।
দ্বিতীয়তঃ এ আইনের অধীনে পরিষদ তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় নির্বাহ।
তৃতীয়তঃ এ আইনের অধীনে অথবা বর্তমানে চালু অন্য কোন আইনে পরিষদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন।
চতুর্থতঃ পরিষদ তহবিলের উপর আরোপিত সরকার ঘোষিত কোন যথোপযুক্ত নির্বাহ।

উপজেলা পরিষদের উপরে আরোপিত বিভিন্ন ধরনের ব্যয় করা যাবে।

উপজেলা পরিষদের বাজেট

প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অর্থ বৎসর শুরু হওয়ার পূর্বে একটি বাজেট প্রনয়ন করবেন। আনুমানিক জমা ও খরচের একটি বিবরন প্রনয়ন করে তা অনুমোদন করবে যা এর পর থেকে পরিষদের বাজেট বলে উল্লিখিত হবে। অর্থ বৎসর শুরু হওয়ার আগে যদি কোন পরিষদ বাজেট প্রনয়ন অথবা অনুমোদন না করে তা হলে সরকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় ষ্টেটমেন্ট প্রনয়ন করে তা প্রত্যায়ন করবে এবং প্রত্যয়নকৃত বিবরনটি পরিষদের বাজেট হিসেবে গন্য হবে। বাজেটের একটি অনুলিপি সরকার ও জেলা প্রশাসকের নিকট পেশ করতে হবে।

সরকারের নিকট প্রেরিত বাজেটের অনুলিপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সরকার বাজেট সংশোধন করতে পারবেন এবং এ সংশোধিত বাজেট পরিষদের

বাজেট হিসেব গন্য হবে। অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাজেটটি বিধি মোতাবেক সংশোধন করা যেতে পারে।

আয় ব্যয় হিসাব এবং অডিট

উপজেলা পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে ও নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষন করতে হবে। প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে হিসাবের বিবরনী সম্পূর্ণ করে তা জেলা প্রশাসক ও সরকারের নিকট পাঠাতে হবে। উপরন্ত জনসাধারনের জ্ঞাতার্থে উক্ত হিসাব বিবরনটি সবার দৃষ্টি গোচরীভূত হয় অফিসের এমন জায়গায় লটকিয়ে রাখতে হবে।

প্রতিটি উপজেলা পরিষদে হিসাব নিকাশের বিবরনী অডিটর এন্ড কম্পট্রোলার জেনারেল নিয়মিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। তিনি হিসাব সংক্রান্ত সমুদয় রেজিষ্টার, দলিলাদী এবং নথিপত্র পরীক্ষা করার জন্য তলব করতে পারবেন। অডিট নিষ্পত্তির পরে অডিট কর্তৃপক্ষ সরকার এবং জেলা প্রশাসকের নিকট অডিট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক সহায়তা মঞ্জুরী (ADP) র আওতায় অর্থ বরাদ্দ এবং তার ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালাঃ

জনগনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত ও কার্যকরী প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পরিষদ সমূহকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে পূরণ করা সম্ভব এমন চাহিদা সমূহ স্থানীয়ভাবে পূরনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহন, স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটিয়ে স্থানীয় সম্পদের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে মূলতঃ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ ব্যবস্থার ফলে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হবে যা কিনা অদুর ভবিষ্যতে পল্লী এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে উপজেলা পরিষদ যাতে পৃথক উন্নয়ন তহবিলের অধিকারী হতে পারে সে জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলা পরিষদগুলির অনুকূলে নিয়মিতভাবে থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত এই অর্থ সরকার নির্ধারিত মানদন্ড অর্থাৎ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে যে নীতি অনুসরন করতে হবে তা নিম্নে বর্ননা করে ফুটিয়ে তোলা হলোঃ

(১) জনসংখ্যা (০.৫)
(২) আয়তন (০.১)
(৩) পশ্চাদপদতার মাত্রা (০.২)
(৪) কর্মতৎপরতা (০.২)

উপরোল্লিখিত তহবিল ব্যতীত উপজেলা পরিষদের নিজস্ব রাজস্ব উদ্বৃত্ত আকারে অথবা অন্য কোন সুত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা উপজেলা পরিষদ সমূহ যে তহবিল লাভ করবে তা স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহে ব্যয় হবে। উপজেলা পরিষদ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, নকশা তৈরী, বাস্তবায়ন ও তত্বাবধানের কাজ যথাযথভাবে প্রনয়নের লক্ষ্যে একটি নির্দেশমালা জারী করা হয়েছে। এই নির্দেশমালার আলোকে প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (AUDP) প্রনয়ন করতে হবে। সরকারীভাবে প্রাপ্ত বরাদ্দ মুলতঃ নিম্নোক্ত মূল খাত সমূহের বিপরীতে ব্যয় করতে হবে।

(ক) কৃষি ও সেচ, শিল্প, বিশেষ করে কুটির শিল্প
(খ) ভৌত (বস্তুগত) অবকাঠামো
(গ) আর্থ সামাজিক অবকাঠামো
(ঘ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং
(ঙ) বিবিধ তৎপরতা

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি নিম্নোলিখিত ছকের বর্ননা মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

খাত	ন্যুনতম অংশ	সর্ব্বোচ্চ অংশ
কৃষি সেচ ও শিল্পঃ		
নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদর্শনী খামার, বীজ, পুকুর খনন মজা পুকুর সংস্কার, গ্রামীন মৎস্য খামার, পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপনসহ সামাজিক বন উন্নয়ন ও ফলমুল ও শাক সব্জীর চাষ, হাস-মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন, জল নিস্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যানিরোধক বাঁধ, কুটির শিল্প কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, আয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতাসমূহ প্রভৃতি।	৩০%	৪০%
বস্তুগত অবকাঠামোঃ		
পরিবরহন ও যোগাযোগ, পল্লীপূর্ত কর্মসূচী, গ্রামীন রাস্তা-ঘাট, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়ন (গৃহ নির্মান ও বস্তুগত পরিকল্পনা) হাট ও বাজার, গুদামজাত করনের সুযোগ সুবিধা, কম্যুনিটি সেন্টার, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি।	২৫%	২৫%

আর্থ সামাজিক অবকাঠামোঃ		
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষা উপ-করনের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ তৎপরতা প্রভৃতি	১৭.৫%	২৭.৫%
ক্রীড়া ও সংস্কৃতিঃ		
খেলাধুলাঃ ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রভৃতির উন্নয়ন	৫%	১০%
বিবিধ কার্যাবলীঃ		
জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে) প্রভৃতি।	২.৫%	৭.৫%

টীকা-১ঃ

উপরোক্ত ছকে বর্নিত খাতওয়ারী অগ্রাধিকারের পরিমাণ বিভিন্ন উপজেলায় বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ভেদে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। তবে কেবলমাত্র ব্যতিক্রম পরিস্থিতি ব্যতীত সাধারণভাবে উপরোক্ত ছকে বর্ণিত খাতওয়ারী বরাদ্দের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে।

টীকা-২ঃ

কোন খাতের অন্তর্গত সংস্কার ও বিশেষ মেরামত প্রকল্পের বরাদ্দ উক্ত খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমিত থাকবে।

টীকা-৩ঃ

কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকল্পের জন্য উক্ত বছরে সেই খাতের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের এক-তৃতীয়াংশের বেশী বরাদ্দ করা যাবে না।

উপজেলাসমূহের এডিপি খাতে প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন করে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, উপজেলা সমূহ বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থ দ্বারা যে সব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে তা যথাযথ নীতিমালা অনুসরন করে বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন করা হয় না। প্রায়শঃই উক্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ত কর্মসূচী বা অবকাঠামো নির্মানের ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় ঝোক প্রবনতা বা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আর কৃষি ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ আসে তাও মূলত সেচ কাজের জন্য ড্রেন নির্মানের মত পূর্ত কর্মগুলি সম্পন্ন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে প্রকল্পগুলি গ্রহন করা হয় তা মূলতঃ পূর্তকর্মসূচী অর্থাৎ স্কুল ঘর নির্মান ও সংস্কারের কাজে ব্যয় করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ যথাযথভাবে নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকল্প গ্রহন করা হয় বলে মনে হয় না।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা

১। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হচ্ছেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে তার মাধ্যমে অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্মকর্তার মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা হবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করবেন এবং উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকবেন।

২। চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের নিম্নোক্ত কাজগুলো নিষ্পত্তি করবেনঃ

(ক) সরকারী কর্মচারী ব্যতীত উপজেলা পরিষদের যে কোন কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, শাস্তি, বা বরখাস্তকরণ,

(খ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত ট্যাক্স, রেট টোল, ফি ও অন্যান্য পাওনা সমূহ আদায়করণ,

(গ) উপজেলা পরিষদের পক্ষে সব অর্থ গ্রহন,

(ঘ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে যে কোন খাতে অনুমোদিত বাজেট থেকে অর্থ ব্যয়করণ,

(ঙ) পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়,

(চ) পরিষদের তরফ হতে পরিষদের বিভিন্ন বিষয় ও কার্য সম্পর্কীয় প্রস্তাব ও প্রকল্পের ব্যাপারে উদ্যোগ ও প্রস্তুতি গ্রহণ,

(ছ) পরিষদ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী সরকারী কর্মকর্তাদের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ,

(জ) লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি মঞ্জুর,

(ঝ) আইনের আওতায় যে কোন অপরাধের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন,

(ঞ) পরিষদের তরফ হতে মোকদ্দমা রুজু করা ও তা চালানো,

(ট) পরিষদ ও উপজেলা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ,

(ঠ) পরিষদের অর্থ ও হিসাব রক্ষণ,

(ড) উপজেলা পরিষদের পক্ষে সব পত্র যোগাযোগ করণ,

(ঢ) উপজেলা পরিষদের পক্ষে নোটিশ জারীকরণ,

(ণ) এ আইনের আওতায় সব অপরাধ নিষ্পত্তিকরণ (কম্পাউন্ডিং) এবং

(ত) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কাজ।

৩। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলার সব উন্নয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করবেন

৪। তিনি সব উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, প্রকল্প চিহ্নিত করবেন এবং এসব পরিকল্পনাগুলোর নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন নিশ্চিত করবেন।

৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় তিনি ত্রান কাজের জন্য দায়ী থাকবেন।

৬। কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনসহ তিনি কর্মসংস্থানমুখী কার্যক্রম সংগঠন ও জোরদার করবেন।

৭। তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী উৎসাহিত করবেন।

৮। প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

৯। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

১০। উপজেলার মধ্যে সরকারী নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যেও তিনি দায়ী থাকবেন।

১১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

১২। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৩। তাঁর আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা (ইউএনও)

১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ষ্টাফ অফিসার। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হবেন প্রধান নির্বাহী এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট দায়ী থাকবেন। উপজেলা পরিষদের নীতি ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে তিনি চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন।

২। উপজেলা পর্যায়ের সব উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ তদারকিতে তিনি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন।

৩। একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে তিনি উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করবেন।

৪। কোন কারণে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হতে অসমর্থ হলে তিনি আদালতে উপস্থিত থেকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন, যেমন - মামলার বিচারাধিকার, জামিন সম্পর্কিত বিষয়ের শুনানী, মুলতবী আদেশ ইত্যাদি।

৫। উপজেলা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্যসহ রিলিফ সামগ্রী গ্রহণ ও মওজুদকরণসহ জরুরী দায়িত্ব পালন করবেন।

৬। প্রটোকল দায়িত্ব।

৭। উপজেলা রাজস্ব ও বাজেট প্রশাসন তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৮। উপজেলা প্রশাসনের ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ প্রতিপালিত হয় কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

৯। উপজেলার মধ্যে তার বিভাগের সকল প্রশিক্ষণের ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকবেন এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন।

১০। তিনি তাঁর অধীনে প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেব দায়িত্ব পালন করবেন।

১১। তিনি তাঁর অধীনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ তদারক করবেন।

১২। তিনি সরকার কিংবা উপজেলা পরিষদ্ চেয়ারম্যান প্রদত্ত অন্যান্য কার্যবলী বা যে কোন আইন বলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কাজ সম্পাদন করবেন।

১৩। তিনি আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে তার এলাকাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আবশ্যিকভাবে পরিদর্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর ক্ষমতা

১। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী মামলা গ্রহণ ও নিস্পত্তির জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

২। তিনি ফৌজদারী আইনের ১৩৩ এবং ১৪৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। তিনি উপজেলা ফৌজদারী নির্বাহী কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করার সময় ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৪। তিনি শুল্ক আইন, খাদ্য আইন ইত্যাদির মত আইনের (এ্যাক্টের) আওতায় ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৫। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লিখবেন।

৬। তিনি তাঁর অধীনে প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৭। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মচারীদের কাজ তদারক করবেন।

৮। তিনি উপজেলায় তাঁর দফতর সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দায়ী থাকবেন।

৯। তিনি বিচারের ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার (ও,সি) এর ক্ষমতা

১। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্বাবধানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন।

২। তিনি উপজেলা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। তিনি অপরাধমূলক কাজ দমন, তদন্ত ও অনুসন্ধান করবেন।

৪। তিনি তদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন।

৫। তিনি পরওয়ানা জারী করা করবেন।

৬। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লিখবেন।

৭। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন।

৮। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের তদারক করবেন।

৯। উপজেলায় তিনি তাঁর দফতর সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দায়ী থাকবেন।

১০। তিনি পুলিশ বিধি ও সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবেন।

উপজেলা অর্থ কর্মকর্তার ক্ষমতা

১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বধানে উপজেলার তহবিল পরিচালনায় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করা এবং চেয়ারম্যানের অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা।

২। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা।

৩। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাজেট অনুমোদনের পর স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান।

৪। উপজেলা তহবিল থেকে উন্নয়ন ও অনুমোদন খাতে ব্যয়ের কর্তৃত্ব দানের ব্যাপারে চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দেওয়া।

৫। উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকারের উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থ ছাড় করার ব্যাপারে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করা।

৬। উপজেলা অর্থ দফতরের সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করা।

৭। যথার্থ দফতরে উপজেলা পরিষদ তহবিলের হিসাব অডিট করানোর কাজে সহযোগিতা করা।

সহকারী কমিশনারের ক্ষমতা

১। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে কাজ করবেন।

২। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করবেন এবং তাঁর উপর অর্পিত ম্যাজিস্টেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। তিনি বিচারযোগ্য মামলা বিচার করবেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পি,আই,ও) ক্ষমতা

১। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের নির্দেশক্রমে কাজ করবেন।

২। তিনি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

৩। তিনি উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিকল্পনা পুস্তকের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কমিটির কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প নির্ধারনে সহযোগিতা করবেন এবং কারিগরী অকাট্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেবেন।

৪। তিনি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ঘনিষ্টভাবে তত্ত্বাবধান করবেন এবং যথাযথভাবে ও সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সরেজমিনে তদন্তের প্রেক্ষিতে সম্পাদিত মাটির কাজের ভিত্তিতে কিস্তিতে শস্য ছাড় করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে সুপারিশ করবেন।

৫। তিনি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর প্রকল্প পরিদর্শন ও মনিটরিং এর ব্যাপারে কেয়ার এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর কর্মকর্তাগণকে সহযোগিতা করবেন।

৬। অডিট/তদন্তের জন্য তিনি সব রেকর্ড পত্রের যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

৭। তিনি ভি,জি,এফ,পি (ভালনারেবল গ্রপ ফিডিং প্রজেক্ট) এবং প্রাতিষ্ঠানিক ফিডিং কেন্দ্রের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দায়ী থাকবেন এবং কেন্দ্র তত্ত্বাবধানে প্রকল্প কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। তিনি গুদামে নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য শস্য নিস্পত্তিকরণ কমিটিরও সদস্য সচিব থাকবেন।

৮। তিনি গ্রামের নেতা ও প্রকল্প কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে প্রকৃত অনুগ্রাহকদের (বেনিফিশিয়ারী) তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে তা পেশ করবেন।

৯। তিনি ভি,জি,এফ,পি কেন্দ্রের পেশকৃত খাদ্য শস্য ব্যবহারের হিসাব ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পেশ করার জন্য সমন্বয় করবেন। তিনি কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করবেন।

১০। টেষ্ট রিলিফ, বিনামূল্যে প্রদত্ত রিলিফ, গৃহ নির্মাণ অনুদান ইত্যাদি সহ এলাকার সব ধরনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

১১। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে ও পরে তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করবেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ক্ষমতা

১। তিনি উপজেলা পরিষদের তদারকীতে থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে কাজ করবেন।

২। তিনি উপজেলা ও তার নিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার কারিগরী ও প্রশাসনিক তত্ত্বধানের জন্য দায়ী থাকবেন।

৩। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও তাঁদের কার্যাবলী তদারক করবেন।

৪। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ব্যয় মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ হবেন এবং তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের নির্ধারিত তহবিলের জন্য একজন আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তাকে বা একজন মেডিক্যাল কর্মকর্তাকে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেব মনোনীত করবেন।

৫। তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন।

৬। তিনি উপজেলা এলকায় অস্ত্রোপচারসহ সব ধরণের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারে দায়ী থাকবেন।

৭। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল প্রশিক্ষণের বিষয়ে দায়ী থাকবেন।

৮। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিক্যাল কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কার্যাবলী ও কারিগরী বিষয় তত্ত্বধানের জন্য দায়িত্ব বন্টন করবেন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ কর্মীদের কাজের পরিধি নির্ধারণ করবেন।

৯। তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য ও হিসাব প্রেরণ করবেন।

১০। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সমস্যা ও কাজের অগ্রগতি ব্যক্তিগতভাবে অবহিত হবার জন্য নিয়মিত গ্রাম ও ইউনিয়ন পরিদর্শনে যাবেন।

১১। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত পরিদর্শক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল ও নির্দিষ্ট প্রতিনিধত্বমূলক সংগঠনসমূহে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের স্বাস্থ্যগত চাহিদা পূরণে সহায়তা করছেন কিনা তার নিশচয়তা বিধান করবেন।

১২। তিনি সময় মত মাল সংগ্রহ, বিতরণ ও তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

১৩। তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। এ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছেঃ

(ক) সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রন।
(খ) পরিবার পরিকল্পনা।
(গ) মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা।
(ঘ) স্থানীয় মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
(ঙ) স্বাস্থ্য শিক্ষা।
(চ) বিশুদ্ধ পানীয় ও পয়ঃ প্রণালী সম্প্রসারণ।
(ছ) পুষ্টি উন্নয়ন।

১৪। তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এজেন্সী সমূহের সাথে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করবেন।

১৫। তিনি তাঁর অধীনে প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত উভয় দফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লিখবেন।

১৬। তিনি ঔষধ আইন, খাঁটি খাদ্য অধ্যাদেশ (পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স) ইত্যাদি সহ সব স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন বলবৎকরণ ও তত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকবেন।

১৭। তাঁর আওতাভূক্ত অন্য যে সব কাজ ও দায়িত্ব অর্পন করা হবে তিনি তা পালন করবেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ক্ষমতা

১। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের তত্বাবধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা পর্যায়ের মূখ্য প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।

২। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আঞ্চলিক প্রকল্প কর্মকর্তার নির্দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সকল কাজ ও নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। সরেজমিনে স্কুল পরিদর্শন, তদারকি ও গণসংযোগের উদ্দেশ্যে তিনি মাসে পনের দিন গ্রামাঞ্চল সফর করবেন এবং পাঁচ রাত সেখানে অবস্থান করবেন। তিনি স্কুল পরিদর্শনের জন্য একটা বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন করে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/আঞ্চলিক প্রকল্প কর্মকর্তার কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। বার্ষিক কর্মসূচীতে প্রতিটি স্কুল বছরে অন্ততঃ দুবার পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪। প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলের জন্য তিনি একটা করে পৃথক ফাইল রাখবেন। এ ফাইলে প্রত্যেকটি স্কুলের ইতিহাস, শিক্ষক-ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা ও স্কুলের বিষয় সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। এ ফাইলে প্রতি ছ'মাস অন্তর স্কুলের সর্বশেষ তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে।

৫। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত শিক্ষা কর্মকর্তা, অন্যান্য কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন, আকস্মিক ব্যয় ইত্যাদি পরিশোধের জন্য প্রাপ্ত তহবিলের টাকা গ্রহণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন।

৬। তিনি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, অন্যান্য কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন, আকস্মিক ব্যয় ইত্যাদি পরিশোধের জন্য প্রাপ্ত তহবিলের টাকা গ্রহণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন।

৭। তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ও শিক্ষকদের পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি পরিশোধের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন।

৮। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/আঞ্চলিক প্রকল্প কর্মকর্তার অনুমোদন নিয়ে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পরিদর্শনের জন্য ১৫ থেকে ২০টি প্রাথমিক স্কুল নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং তাদের কর্মতৎপরতা তদারক ও মূল্যায়ন করবেন।

৯। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সহায়তায় তিনি তাঁর এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তা নিয়মিত উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করবেন।

১০। তিনি উপজেলায় তাঁর বিভাগ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ের জন্য দায়ী থাকবেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার ক্ষমতা

১। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে পরিষদের তত্বাবধানে কাজ করবেন।

২। তিনি তাঁর ইউনিটের অধীন সকল কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজের সমন্বয় সাধন করবেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য দায়ী থাকবেন।

৩। তিনি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, সেচ যন্ত্রপাতি বিতরণের কাজে সমন্বয় সাধন করবেন।

৪। তিনি উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন এবং ব্যক্তিগত জমিতে মডেল কৃষি খামার চালু ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সমন্বয় সাধন করবেন।

৫। তিনি যোগাযোগ, সেচ ও পানি নিস্কাশনের জন্য খাল খনন, পুনঃ পুনঃ খনন, আন্ত-ইউনিয়ন পরিকল্পনা ও উপজেলা সেচ প্রকল্পের কাজের সমন্বয় বিধান করবেন।

৬। নিবিড় ধান চাষের ব্যাপারে উৎসাহ দান করবেন।

৭। পাট ও রবিশস্য সম্পর্কিত প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৮। ফল ও শাক-শব্জির উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। ফসল উৎপাদনের প্রতিযোগিতা ও মেলার আয়োজন করবেন।

১০। গোবর ও জৈব সার তৈরীর জন্য উৎসাহ দান করবেন।

১১। উপজেলা পরিষদের অনুমতিক্রমে উৎপাদন খাতে ব্যবহারের জন্য পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন।

১২। গুদাম নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩। প্রদর্শনী খামারের সাথে কৃষক সার্ভিস সেন্টার রক্ষনাবেক্ষণ করবেন।

১৪। তিনি সম্প্রসারণ ও সরবরাহ কর্মীদের কাজের তদারকি করবেন।

১৫। তিনি নলকূপ বসানো, পাম্প বসানো ও তা রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৬। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লিখবেন।

১৭। তিনি তাঁর অধীনে সরাসরিভাবে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন।

১৮। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের তত্বাবধান করবেন।

১৯। তিনি উপজেলায় তাঁর বিভাগ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ের জন্য দায়ী থাকবেন।

উপজেলা প্রকৌশলীর ক্ষমতা

১। তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের তত্বাবধানে কাজ করবেন।

২। তিনি জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবেন। বিশেষভাবে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম বিধিসম্মতভাবে বাস্তবায়নের কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

৩। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশ ও তত্বাবধানে উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের জন্য দায়ী থাকবেন।

৪। তিনি উপজেলা পরিষদের সকল উন্নয়নমুলক কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন।

৫। তিনি উপজেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের রক্ষনাবেক্ষণ এবং মেরামত ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন ও দাখিল করবেন।

৬। তিনি তাঁর অধীনে উন্নয়নমূলক কাজের রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের সামগ্রী সংগ্রহ ও মওজুদ রাখবেন এবং বিধি অনুযায়ী ও পদ্ধতিগত ভাবে স্টক হিসাব রাখবেন।

৭। কার্যস্থলের অর্ডার বই, কাজের ডায়েরী এবং কার্যস্থলের সামগ্রীর হিসাব রাখাসহ তিনি উপজেলা পরিষদের কাজের তত্বাবধান করবেন।

৮। তিনি তাঁর অধীনে সম্পাদিত কাজের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি মোতাবেক ও পদ্ধতিগতভাবে রাখবেন।

৯। তিনি স্টোর মালামাল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। সময়মত স্টোর ও মালামাল পরীক্ষা করার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

১১। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার সাথে সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবেন।

১২। তিনি উপজেলায় সব নির্মাণ কাজ ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজে কারিগরী বিষয়ে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ দেবেন।

১৩। উপজেলা পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষনের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

১৪। বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

১৫। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গোপনীয় রিপোর্ট লিখবেন।

১৬। তিনি তাঁর অধীন সরাসরি কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৭। তিনি তাঁর অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের তদারকি করবেন।

১৮। তিনি তাঁর বিভাগ সম্পর্কিত উপজেলায় সকল প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দায়ী থাকবেন।

উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ যে সব কাজ করে থাকেন তাদের কাজ ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে থাকেন। এ সব কর্মকর্তাগন উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য যে সব দায়িত্ব পালন করে থাকেন তা কোন অংশে কম গুরুত্ব বহন করে না। তবে আলোচনার কলেবর অযাচিতভাবে যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সকল কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলী আলোচনা না করে শুধুমাত্র যে সব কর্মকর্তা আপাতঃ দৃষ্টে গুরুত্বপূর্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

উপসংহার

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিশেষতঃ উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে অর্থাৎ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation) ও ক্ষমতা অর্পন (Devolution) করতে হবে। ক্ষমতা অর্পন এবং বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত যত আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন, অথবা যত বই-পুস্তক লেখা হোক বা গবেষণা করা হোক না কেন বাস্তবিক অর্থে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। স্থানীয় সরকার, উপজেলা পরিষদ আইন প্রণয়নের সাথে সাথে নির্বাহী আদেশ বলে থানা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারী দপ্তরগুলি তাদের জনবল, কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দ, উপজেলা পরিষদের কাছে প্রেষনে নিয়োগাদেশসহ সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করলে প্রকৃত অর্থে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়নমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। বিকেন্দ্রীকৃত কার্যক্রম হস্তান্তরিত আকারে চালুর পর পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজধানীতে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহের হেড অফিস থেকে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং কি কি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে যে সব কাজ উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তর করা সম্ভব তা চিহ্নিত করা যেতে পারে। আসলে যে সব কাজ উপজেলা পর্যায়ে হস্তান্তর করা সম্ভব সে সব কাজকে আবশ্যিকভাবে উপজেলায় হস্তান্তরিত করার পরে বাকী কাজগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের

আওতায় রেখে দেয়া যেতে পারে। ১৯৭২ সনে গঠিত "Administrative and service re-organisation Committee" তার রিপোর্টে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাদের উপর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পনের সুপারিশ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভূক্ত থাকার মত নয় এ ধরনের সকল কার্যক্রম স্থানীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরের জন্য একটি কমিটি জোরালোভাবে সুপারিশ করেছিল। যা কিছু স্থানীয় সরকার পর্যায়ে করা সম্ভব তার সবটুকু দায়িত্বই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পন করা উচিত বলে এ কমিটির রিপোর্ট মত প্রকাশ করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্থানীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা ও কার্যক্রম হস্তান্তরের কোন ধরা-বাঁধা বা অপরিবর্তনীয় কোন বিধি-বিধান রাখার প্রয়োজন নেই বলে কমিটি মনে করেছে। ১৯৮২ সালের প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস বা সংস্কার কমিটি ১৯৭২ সনে গঠিত প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস কমিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্য যে সুপারিশ রেখেছিল তা বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৯২ সালে গঠিত নুরুন্নবী কমিটিও অনুরুপ মত প্রকাশ করেছে। আর স্থানীয় সরকার কমিশন যে প্রতিবেদন দাখিল করেন (মে ১৯৯৭ইং তারিখে) তাতে জোরালো ভাবেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজেলা পরিষদকে অতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার জন্য জোর সুপারিশ করেন। এ কমিশন এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, শুধু কমিশন গঠন করাই যথেষ্ঠ নয়। কমিটির সুপারিশমালা যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় সেদিকে সরকারের জোরালো প্রচেষ্টা থাকা উচিত। কমিশন মনে করে যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে নবতর কলেবরে যেভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন ও ক্ষমতা অর্পনের জন্য প্রথম ধাপটি বেশ সহজভাবে এবং প্রায় তাৎক্ষনিকভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা এবং যেখানে নতুনভাবে গঠন করা প্রয়োজন সেখানে তা করা হলে সে আইনের মাধ্যমে নির্বাহী আদেশ জারী করে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত স্থানীয় সরকারের কাছে বিদ্যমান সরকারী দপ্তরগুলিকে জনবল, কার্যক্রম ও বাজেট বরাদ্দসহ হস্তান্তরিত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে এসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন্ কোন্ কাজ স্থানীয় সরকারের কাছে বিভিন্ন স্তরে হস্তান্তর করা যেতে পারে সে সমস্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য একটি শ্বশাসিত প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি স্থানীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর যোগ্য (Transfered subject) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সংরক্ষণ যোগ্য (Retained subject) বিষয় সমূহের তালিকা প্রস্তুত করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও তদারকীর জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন উচিৎ বলে

এই কমিটি মনে করে। তাছাড়া প্রশাসনিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে আর্থিক দিক দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী হওয়া উচিৎ। এজন্য স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বাবলী এবং কার্যক্রমের সঙ্গে তাদেরকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ আহরন এবং সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে যথাযথ প্রবাহ থাকা উচিৎ। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ সফল ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে অপর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের নানা প্রতিবন্ধকতা এবং ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সম্পদ আহরনের ব্যর্থতাই প্রধান। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব, স্থানীয় সম্পদের অভাব, সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালার অপ্রতুলতা, কর আদায়ে অনীহা, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহে দক্ষতার অভাব, কর আদায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি দৈনন্দিন এবং উন্নয়নমূলক কাজের অর্থায়নে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। এসব ব্যর্থতার বিষয়গুলি স্মরনে রেখে আবশ্যিক এবং কার্যকরিভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষতঃ উপজেলা পরিষদকে প্রশাসনিকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং আর্থিকভাবে যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করে প্রকৃত ও পুর্নাঙ্গভাবে শক্তিশালী (Empowerd) করার জন্য আন্তরিক এবং কার্যকরভাবে প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে। শুধুমাত্র খোলস বদল করে নয়, যে দিন প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজেলা পরিষদ প্রশাসনিক দিকে থেকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে সেদিনই প্রকৃতভাবে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি একটি কার্যকরি এবং জনকল্যাণমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Ali AMM, Showkat. Field Administration & Rural Development in Bangladesh, Dhaka, CSS-1982।

Ali Shaikh Maqsood et al. Decentralization and People's Participation in Bangladesh, Dhaka, NIPA. 1983।

Alam. Manjur-ul. Local Government at work in Rural Bangladesh. Jornal of BARD. vol. VI, No. 2, 1977. PP. 17-25.

Ahmad. J. Minhasuddin. Training Union Parishad Chairmen Bogra, RDA, 1980.

Alam Majuir-ul: Leadership Pattern, Problems and Prospects of Local Government in Rural Bangladesh; Comilla, BARD, 1976.

Government of Bengal (Legislative Department). The Village Chowkidari Act. 1870. BG Press. Alipore. 1890.

Government of East Bengal (Legislative Department). The Bengal Self Government Act. 1919. BG Press Alipore, 1919.

Islam. Shamsul. Local Government and National Development Quarterly. Vol. 6c. No. 3, 1977.

Khan, Md. Mohabbat and Zafarullah. Md. Habib (ed) Rural Development in Bangladesh: Trends and Issues, Dacca, Centas, 1981.

Molla. Md. Giasuddin. New Hopes for Union Parishads: Case of Bangladesh, Administrative-Science Review, Vol. 1, 1978. PR 43-47.

Rahim. Lutfur and Das. Noor Union parishad Taxes: Nature of payment by the farmers. Administration Science Review. No. X, No. 4m, 1980 PP. 17-28.

Rahim. Atiur, Rural power Structure: A study of the Local level Leader in Bangladesh: Dhaka, BBI, 1981.

Sobhan. R. (1978) Basic Democradis, Works Programmes, and Rural Development in East Pakistan, Dhaka: Bureau of Economic Research.

Tepper, E,L, (1976) The Administration of Rural Reform; Structural Constraints and olitical Dilemmas, in Stevens R.D. et al (eds) Rural Developemnt in Bangladesh and Pakistan. Honolulu the University Press of Hawaii, PP-29-59.

আব্দুল কাদের, মুহাম্মদ, বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ, লোক প্রশাসন সাময়িকী, অষ্টম সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

আজম, কে, কিউ এবং হোসাইন, আলী আজম, ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা চেয়ারম্যানবৃন্দ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন Local Governemnt Quarterly Vol.8, No. 1-4. 1979. PP. 52.

আলম, জগলুল গ্রামীণ প্রশাসনঃ কয়েকটি সমস্যা, দৈনিক বাংলা, ২০শে জুলাই, ১৯৮২।

আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন। ঢাকা, ১৯৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার কমিশন, ১৯৯৬ (মে, ১৯৯৭ইং তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেন)।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার, আইন মন্ত্রণালয়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯, ইপিজি প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৬।

ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ, লোক-প্রশাসনের রুপরেখা, ঢাকা বুক হাউজ, ১৯৭৯।

রহমান এ, এইচ, মোঃ আমিনুর, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা, Local Government Quarterly Vol. 7, No.1-4, 1978.

রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭, ১৯৭২।

রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২, ১৯৭৩।

হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

সিটিজেন চার্টারঃ একটি মাইল ফলক

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন*

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নিগড় বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া বাংলাদেশের আজন্ম পাপ। তাই শুরু থেকেই প্রশাসনিক সংস্কার এজেন্ডা হিসাবে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। জন্মগত সামাজিক পরিমন্ডলে প্রাথমিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল পুঁজিবাদি ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে সমাজবাদি কল্যান রাষ্ট্র-প্রশাসনে রুপান্তরিত করা। সে কারনে শ্রেণী বিন্যাস ভেঙ্গে দিয়ে প্রশাসনের মূল ধারায় গণচেতনা আনয়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে অভিজাত শ্রেণী আমলাতন্ত্রের পূণরুত্থান ঘটে । তবে খোদ পুঁজিবাদি পশ্চিমা দেশ সমূহে ততদিনে প্রশাসনিক সংস্কার জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। ঐ সকল দেশ এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রযুক্তি ও অর্থানুকূল্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পশ্চিমা ধাচের প্রশাসনিক সংস্কার এজেন্ডা হিসাবে গ্রহণ করতে হয় - একই সাথে। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর এ ব্যবস্থা সর্বরোগের একমাত্র মহৌষধ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু গত আড়াই দশক ধরে সংস্কারের ঝান্ডা সদ্য উত্তোলিত রাখা সত্বেও এদেশে প্রকৃত সংস্কার কিছু হয়েছে কি? মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী দেশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল এ সময় দেশ শাসন করেছে। প্রতিটি সরকার প্রশাসনিক সংস্কারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। প্রতিটি পরবর্তী সরকারের সময় উক্ত অঙ্গীকার জোরদার হয়েছে এবং আরোপণ থেকে ক্রমান্বয়ে প্রত্যয়ে পরিনত হয়েছে। বর্তমান সরকার সংস্কার কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং সুচিন্তিত প্রস্তাবনা ও প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রী পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যানের অধীনে এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন পুনর্গঠিত করেন। উক্ত কমিশন তার মেয়াদ কালের মধ্যে প্রদত্ত ৩০টি প্রস্তাবনা সমন্বিত করে চুড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করছে। শর্ত মোতাবেক তাৎক্ষণিক কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে খন্ড খন্ড হিসাবে পেশকৃত ৩০টি সুপারিশের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ (২৩তম) সুপারিশ "পারফরমেন্স স্টান্ডার্ড ও সিটিজেন চার্টার" এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা (MATT) প্রশিক্ষণোপলক্ষ্যে সম্প্রতি ব্রিটেন সফরকালে সে দেশের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ হয়।

অন্যান্য উন্নত দেশে সংস্কারের হাল হকিকত সম্পর্কেও কিছু আলোক সম্পাত হয়েছিল। উক্ত আলোক বর্তিকায় এদেশের প্রশাসনিক অন্ধকার প্রশমিত করা প্রয়াসে এ প্রবন্ধ।

*মেম্বার ডাইরেক্টিং ষ্টাফ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

২। তৎকালীন লেবার সরকার গঠিত ফুলটন কমিটি (The Fulton Comittee) কর্তৃক ১৯৬৮ সনে পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয়েছিল যেঃ

- ❐ অতি অল্প সংখ্যক কর্মীই পরিচ্ছন্ন ও পরিমাপযোগ্য বস্তুনিষ্ঠ কাজ করে থাকেন।
- ❐ কর্মীগন কাজের (task) পরিবর্তে গ্রেড বিন্যাস হিসাবে সজ্জিত হয়ে থাকেন।
- ❐ কি অর্জন করতে পেরেছেন তার পরিবর্তে কি করণীয় ছিল সেটাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
- ❐ ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রবাহ নড়বড়ে বা অনুপস্থিত।
- ❐ কার্য সম্পাদনের সঙ্গে বেতন সঙ্গতি নেই।
- ❐ কতিপয় সিভিল সার্ভেন্ট নিজেদেরকে জনগণ ও সম্পদের নিয়ন্ত্রক ভেবে থাকেন।
- ❐ প্রশিক্ষণ আধুনিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সিভিল সার্ভিস কার্যকারিতার পরিবর্তে পদ্ধতিমুখী।

সুতরাং ফুলটন কমিটি সুপারিশ করেনঃ

- ❐ সরকারী খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ❐ ব্যবস্থাপনা/বৃত্তিমান সংস্কৃতি সৃষ্টি করুন।
- ❐ জনশক্তি সংক্রান্ত ও আর্থিক ক্ষমতা ডেলিগেট করুন।
- ❐ ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য প্রবাহ ও প্রশিক্ষণ উন্নত করুন।
- ❐ ব্যক্তিখাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।
- ❐ ব্যয়-সার্থক সার্ভিস প্রদান করুন।

৩। ফুলটনের রিপোর্ট প্রদানের দশ বছর পরেও বৃটেনে ৭৩২,০০০ কর্মী, ১২টি গ্রেড, ২০টি বৃহৎ বিভাগ ছিল। অতি-কেন্দ্রিক, কেন্দ্র প্রয়োগিত পদ্ধতি, মন্থর গতির আমলাতন্ত্র এবং গোপনীয়তা ও নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ছিল ১৯৭০ দশকের শাসন ব্যবস্থা। অবশ্য '৮০ দশকে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। ১৯৮৬ সনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের উপদেষ্টা স্যার রবিন ইব্‌স এক প্রতিবেদনে সিভিল সার্ভিসের আকৃতি ১৯% এবং খরচ বার্ষিক এক বিলিয়ন পাউন্ড হ্রাস করণের তথ্য সরবরাহ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্থর অগ্রগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুততর অগ্রগতির পন্থা উদ্ভাবনে ব্যাপক অনুশীলনীর জন্য স্যার রবিনের নেতৃত্বে ব্যক্তিখাত ও সিভিল সার্ভিসের প্রতিনিধি সমন্বয়ে Efficiency Unit গঠন করেন। উক্ত ইউনিট ১৯৮৭ সনে "The Next Step" (পরবর্তী - ধাপ) নামে অভিহিত সরকারী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (Improving Management in Government) সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এর উদ্দেশ্য (aim) হলোঃ সিভিল সার্ভেন্টদের কাজ অধিকতর ভালভাবে সম্পাদনের উপকরণ যোগান দেয়া। এ ব্যবস্থা অধিকতর খরিদ্দার (Customer) মুখী ও সার্ভিসের মাধ্যমে অধিকতর আর্থিক মুল্য প্রদানের

সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ঐতিহ্যগত ক্ষমতা সংগঠিত ও বৃদ্ধি করে। Next step সুপারিশ বাস্তবায়ন পদ্ধতি হিসাবে সংক্ষিপ্ত রাস্তা বর্ণনা করা হয় এভাবেঃ

- দেখতে হবে কাজটি বন্ধ করে দেয়া সম্ভব কিনা;
- যদি না যায়, তাহলে ব্যক্তিমালিকানায় দেয়া যায় কিনা;
- যদি সেটাও সম্ভব না হয়, নির্বাহী এজেন্সির (Executive Agency) মাধ্যমে পরিচালনা করা;

পরবর্তী ধাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি এজেন্সি স্বতন্ত্র হবে এবং নানা প্রকৃতির সরকারী সার্ভিস স্পষ্ট প্রতিফলিত হবে।

এজেন্সি সম্পর্কিত কল্প কথা হলোঃ

- এজেন্সি গঠনের ফলে আপনা-আপনি কার্য সম্পাদন তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।
- প্রথম কয়েকটি এজেন্সি গঠনের মাধ্যমে একটি দিক নির্দেশনা মডেল বা ব্লুপ্রিন্ট উদ্ভাবন করা।
- এজেন্সি গঠন মানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা।
- এজেন্সি কর্মীগণ সিভিল সার্ভেন্ট নন।
- আজ এজেন্সি, কাল প্রাইভেটাইজেশন।
- অতি সাধারণ কার্যক্ষেত্রের জন্য এজেন্সিই কেবলমাত্র উপযোগী।
- নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে এজেন্সি নাক গলাবে না।

৪। প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার এবং সিভিল সার্ভিস (Home) প্রধান Sir Robert Armstrong তাদের পূর্ণ আনুকূল্য প্রদান করেন Next step এর প্রতি এবং Whitehall অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Peter Kemp কে তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বৃটিশ প্রেস এ ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানায়। এ প্রসঙ্গে 'সিভিল সার্ভিস ভিশন' বর্ণনা করে বলা হয় যে, "আমরা অধিকতর খরিদ্দার মূখী সিভিল সার্ভিস চাই, যা বর্তমান দুনিয়ার অবস্থান প্রতিফলিত করে। জনগণ অন্যরকম, মন্ত্রিগণ ভিন্নতর, দুনিয়া বদলে গেছে এবং সিভিল সার্ভেন্টদের এই পরিবর্তিত দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে"।

৫। অক্টোবর ০১, ১৯৮৮ প্রথম "Vehicle Inspectorate" এজেন্সি সৃজন করা হয় এবং ঐ বছরের মধ্যেই মোট ১২টি এজেন্সী কাজ শুরু করে যার কর্মী সংখ্যা ২১০,০০০ (সরকারী কর্মচারীর অর্ধেক প্রায়)। এপ্রিল'৯৩ পর্যন্ত ৮১% সিভিল সার্ভিস দপ্তর এজেন্সীতে রুপান্তরিত হয়। ১৯৯৯ পর্যন্ত যে সব এজেন্সী গঠিত হয় তার মধ্যে শেষ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এজেন্সী হলোঃ

- Social benefits - Valuation Office
- Ordinance Survey - Environment

- Royal Mint - Child Support
- Customs & Excise - RAF Training

Property Holdings

Medicines Control

৬। ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের মানসে ইত্যবসরে নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট এবং তৎপর বিজনেস এক্সেলেন্স মডেল (Business Excellence Model) অনুসরণ করা হয়। ইহার ফলে সরাসরি সার্ভিস গ্রহণকারী কাষ্টমার এবং সম্পদ যোগানদার বা কর প্রদানকারীগন - উভয়কে পরবর্তী-ধাপের উদ্দেশ্যে অনুসারে উন্নততর সার্ভিস প্রদান ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু এতসব পরিবর্তন ও সংস্কার কর্মকান্ড কি বিনা প্রতিবন্ধকতায় সাধিত হয়েছে ? নাকি নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে সকলে ! মোটেও নয়। ইফিসিয়েন্সি ইউনিট পরবর্তী ধাপ স্কেল অনুসারে বৃহদাকার ও প্রাচীন পন্থী ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসে পরিবর্তন আনয়ন অত্যন্ত দুরুহ ছিল বলে স্বীকার করেছেন। সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অঙ্গীকার, উচ্চতর নেতৃত্ব এবং সুনির্দিষ্ট প্রকল্প সমর্থন ছাড়া পরিবর্তন আদৌ করা যেত কিনা - এ ব্যাপারে ইউনিট সন্দিহান ছিল। কেননা ক্রান্তিকাল সফলভাবে সংগঠন সম্ভব না হলে ব্যবস্থাপনা অধিকতর স্বাধীনও ইতিবাচক না হয়ে কায়েমী স্বার্থ ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারতো।

৭। প্রধানমন্ত্রী জন মেজর জুলাই ১৯৯১ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সিটিজেন চার্টার (The Citizen's Charter) নামে একটি শ্বেতপত্র উপস্থাপন করেন। মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত উক্ত শ্বেতপত্রের প্রারম্ভিক স্তম্ভে বলা হয়ঃ

"The Citizen's Charter is about giving more power to the Citizen. .... The citizen's charter is not a recipe for more state action; it is a testament of our belief in people's right to be informed and choose for themselves. The white paper sets out the mechanics for improving choice, quality, value and accountability. Not all apply to every service. But all have a common objective; to raise standard of public service, up to and beyond the best at present available. .... For this white paper is only beginning. Over the coming months, Ministers will be bringing forward more detailed plans for each service. But today we provide some early examples of how the Principles of the Charter will be applied. How we will, for example, be introduce guaranted maximum waiting times for hospital operations. How we will require all schools to provide parents with reports. How British

Rail will introduce new compensation schemes for poor service. How those who regulate electricity, water, gas and telecommunications will be given the same strong powers to insist on good service standards for the customer. How we will toughen up inspection and audit, relate pay more closely to perfomance, and provide the citizen with more and better information."

শ্বেতপত্রে চার্টার নীতিমালার মূল ধারণা (main theme) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

- কোয়ালিটি - সার্ভিস কোয়ালিটি বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত নুতন প্রোগ্রাম।
- পছন্দ (Choice) - যেখানে যেমন সম্ভব প্রতিযোগী যোগানদারদের মধ্যে পছন্দ গুন বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।
- স্ট্যান্ডার্ড - যেখানে সার্ভিস গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে নাগরিকদের জানানো হবে কতটুকু সার্ভিস মান আছে বা বজায় থাকবে।
- ভ্যালু - নাগরিকগণই করদাতা। জাতি যতটুকু কর প্রদানে সক্ষম হবে তার যথোচিত মূল্য পাবলিক সার্ভিস প্রদান করবে।

শ্বেতপত্রে চার্টার বাস্তবায়ন কর্মকৌশল; রোগী, অভিভাবক, ভাড়াটে, পরিবহন, চাকুরী প্রার্থী, রাজস্ব বিভাগ, পুলিশ, ফৌজদারী বিচার আদালত, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রামানিক চার্টার ধারনা; ডেলিভারী গুনমান; যাচাই অগ্রগতি (অডিট, ইন্সপেকশন) এবং অভিযোগ ও প্রতিকার - সম্পর্কে সংক্ষেপ নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে ব্রিটেনের অধিকাংশ পাবলিক সার্ভিস ইতোপূর্বে আলোচিত এজেন্সির মাধ্যমে সিটিজেন চার্টার অনুসরণও বাস্তবায়ন করেছে। স্বেতপত্রের উপসংহারের শেষ বাক্যটি হচ্ছেঃ

"For the public they serve, it will bring commitment to quality, and a power to secure it, that will put Britain ahead of any country in the world".

৮। বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্রের তুলনায় ব্রিটেন কতটুকু অগ্রণী স্থান দখল করে আছে তার বিশ্লেষণ না করেও নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে আমরা ব্রিটেনের অবস্থান থেকে বহু যোযন দুরে রয়েছি। পশ্চিমা উন্নত বিশ্বের কিছু দেশ অবশ্য ব্রিটেনকে বহুপূর্বে অতিক্রম করে চলে গেছে বহুদুর। এমনকি সদ্য উত্থানশীল কতিপয় দেশও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে ধরে ফেলেছে। নব উত্থিত এশিয়ান টাইগার মালয়েশিয়ার কথাই ধরা যাক। এখানে ঐতিহ্য সুপ্রাচীন নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও মূল্যবোধ এখন পর্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত নয়, পুলিশ দুর্নীতিপরায়ন এবং বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত বলে ধারনা সর্ববিদিত। তা সত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা অভাবনীয় সাফল্য

অর্জন করেছে। অর্জনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসাবে গন্য করা হয় মালয়েশিয়ান পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধিকে। কর্ম সম্পাদন সম্পর্কিত বেতন-ভাতা প্রদান বিধি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মালয়েশিয়া সিটিজেন চার্টার বা ক্লায়েন্ট চার্টার অনুসরণ করে চলেছে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে। সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফরকালে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা, মান-উন্নয়ন ও উন্নতমান বজায় রাখা এবং নাগরিকদের পছন্দকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের মত বিজনেস মডেল সর্বত্র বিরাজমান লক্ষ্য করেছি।

৯। সিটিজেন বা কাষ্টমার চার্টার কোন এজেন্সি, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কাষ্টমারদের নিকট লিখিত অঙ্গীকার নামা। এখানে কাষ্টমার দেশের আপামর জনসাধারন হতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট উপকরণ বা সার্ভিস ভোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোত্রের, শ্রেণীর, এলাকার বা বয়সের সীমিত জনগোষ্ঠী হতে পারে। কাষ্টমার সীমিত বা অসীম যাই হোক না কেন এটা এজেন্সী বা সংস্থার পক্ষ থেকে প্রদত্ত পূর্ব নির্ধারিত ও প্রবর্তিত সার্ভিস, কোয়ালিটি, স্ট্যান্ডার্ড, ইত্যাদি সম্পর্কিত নিশ্চয়তা বা গেরান্টি। সুতরাং চার্টারের সংকল্প বা লক্ষ্য হচ্ছে কাষ্টমারের পূর্ণ পরিতৃপ্তি বা সন্তুষ্টি সাধন ও তাদের অর্থের যথোচিত মূল্য চরিতার্থতা। বর্তমান যুগে কাষ্টমার চার্টার একটি গতিশীল ধারনা এবং এটা এজেন্সী ও বিভাগের সার্ভিস উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবে এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই। তবে কথা হচ্ছে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটা কোথায় কতটুকু কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে ? অনেকে মনে করেন এটা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বহু পূর্বেই প্রবর্তিত হওয়া উচিত ছিল। চার সচিব প্রণীত "Towards Better Government in Bangladesh" (১৯৯৩), বিশ্ব ব্যাংক আনুকূল্যে প্রণীত "The Government That Works" (1995), MATT Portfolio Project group report "The Performance Appraisal System of the Civil Servants of Bangladesh" (১৯৯৬) - এ সকল রিপোর্টই সিভিল সার্ভিসের বর্তমান মানকে অত্যন্ত নাজুক অভিহিত করেছে, উন্নয়নের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে এবং বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় টিকে থাকার মত দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে কাষ্টমার চার্টারের মত গতিশীল ও চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে। দেশের আর্থিক উন্নয়নের সহযোগী উন্নত-দেশসমূহ এবং বিশ্ব ব্যাংক প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচীকে রীতিমত আর্থিক আনুকূল্যের অন্যতম শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাপ এবং সরকারী সদিচ্ছা প্রসূত অঙ্গীকার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনে উদ্দীপনা যুগিয়েছে। আর সেই কমিশন এখন সুপারিশ প্রদান করেছে সিটিজেন চার্টার প্রবর্তনের। সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এটি একটি স্বীকৃত বিষয়। এখন দেখা যাক বাংলাদেশে বর্তমান

পটভূমিকা কি অবস্থানে রয়েছে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে চর্চিত দু'একটি কেসের উদাহরণ প্রদান সমীচীন হবে বলে মনে করি।

(ক) উদাহরণ - একঃ PWD: How to chain this Wild - Elephant ?

Public Works Department (PWD) plans, designs, estimates, constructs and maintains public offices and residential establishments, except a few which have been specifically entrusted to other departments. It is rated a grade-I service department of the government, by the government and for the government. Providers themselves being the stakeholders, service delivery must be expected to be the highest. But unfortunately, actual position transpires a reverse scenario. In a nutshell, -

i) the quality is lowest but the cost is highest;
ii) procrastination and non-responsiveness has become hallmark;
iii) users are not informed about the work done and cost incurred which indicates total absence of transperancy;
iv) never pay any heed to users requirements even in case of repair works. So it is most autocratic and non-accountable;
v) officials of the department are described as "lords of the people" and neither servants nor friends to customers.

All the participants, somehow or the other, have long experience and attachemnt with the activities of PWD. Most of them are living in the organizastion's quarter and paying 5% of pay for maintenance in addition to surrendering house rent allowance, otherwise entitled to get. But how much value they are getting for their money, they know better. In the advanced country like UK most of such departments previously run by the government has been transformed into private agencies. Even the most basic department like Revenue, passport and Customs services have become agencies. In some cases big departemnts has unbundled and most of its segregated organs have been privatized or made agencies, this has raised their efficiency many times. The participants of a workshop held at Planning Academy on 28-29 September'99 under the auspices of Privatization Board unanimously suggested that PWD and DESA be privatized at an early date. The State Minister for Planning and the Secretary, Planning Ministry among other were present on that very occasion.

The PARC however designed customers charter to address low profile problems of PWD.

There is every possibility that privatization will invite unrest among the employees and on the contrary customer charter will be frustrated by them like other attempted reforms. Now, the question remains what the government will do ?

Objectives of the Study

All the participants being fully accustomed with the PWD activities have much practical experience about and complains against the directorate. They are also important and active machinery of the government to suggest policies and implement decisions. In this circumstances they are the most appropriate persons to conduct a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites and Threats) analysis of the issue to formulate a rightful decision to be taken by the government.

Suggested Questions

01. Imagine that you are the persons responsible to look into the problem. How would you address the problem?

02. Would you agree to privatize PWD (as a whole or in part) ? If yes, how ? If not, why ?

03. Do you think that introduction of customer's charter in PWD is possible at the present context ? How it could be implemented perfectly ?

উপরোক্ত কেসটি ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক জন প্রশাসন ইনস্টিটিউট (HAP) এবং বিপিএটিসি, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে ৩১-১০-৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অনুশীলিত হয়। উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ২৭ জন যুগ্ম-সচিব ও ৩৭ জন উপ-সচিব এবং সমমানের সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা। বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের Mr. Lionel Charty ও Mr. Philip Malgras সহ বিপিএটিসির কতিপয় প্রশিক্ষক। তিনটি গ্রুপে বিভক্ত অংশ গ্রহণকারীগণ প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ সুপারিশ ছিল নিম্নরূপঃ

- প্রাইভেটাইজেশনই হবে চূড়ান্ত সমাধান।

- মাঠ পর্যায়ের কার্যাবলীর দায়িত্ব জেলা পরিষদের উপর অর্পন করা যায়। কেবলমাত্র কতিপয় দক্ষ ও সৎ কর্মচারীকে জেলা পরিষদ সম্পৃক্ত করা যায়।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি ক্ষুদ্র ইউনিট রাখা যেতে পারে প্লানিং, ডিজাইনিং, এষ্টিমেটিং এবং পার্লামেন্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভবন সমূহের মেরামত কাজ দেখার জন্য। অন্য সব কাজ কন্ট্রাকের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
- কাষ্টমার চার্টার প্রদান পূর্বক পিডব্লিউডি কাজের মান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চত করতে পারে।
- উদ্বৃত্ত জনবলের কিয়দংশ কতিপয় সংশ্লিষ্ট বিভাগে আত্মীকৃত হতে পারে। বাকীদের গোল্ডেন হ্যান্ডসেকের মাধ্যমে বাদ দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে বিধায় দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) উদাহরণ-দুইঃ ডেসা মানে ডেঁড়েমুষে সাবাড় বা ডেঙ্গু সাপ্তপদীন

জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা সরকারী বাসভবনে উঠেন ডিসেম্বর'৯৬। স্বয়ং নির্ধারণী পদ্ধতিতে বিল প্রদানের বই অথবা মাসে মাসে নিয়মিত বিল প্রাপ্তির মৌখিক চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ০৫-০৩-৯৭ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী (বানিজ্যিক) বরাবর লিখিত আবেদন করে ব্যর্থ হন। ০৯-০৪-৯৭ইং তারিখে পুনঃ লিখিত আবেদন করেন এবং ডেসার উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তদবির করে মে'৯৭ - এ ডিসেম্বর'৯৬ - এপ্রিল'৯৭ পাঁচ মাসের ১ম বিলটি পান। বার বার অভিযোগ করেও বিল প্রদানের নির্ধারিত তারিখ শেষ হয়ে যাবার পর বা দু'একদিন পূর্বে বিল প্রাপ্তির নিয়মের কোন হেরফের করতে পারেনি। ১৯৯৭ এর শেষ দিকে দু'মাসের বিল ভুল থাকায় লোক পাঠিয়ে ঠিক করিয়ে এসে পরিশোধ করতে হয়। বিলসমূহ নিয়মিত পরিশোধ করা সত্ত্বেও নভেম্বর'৯৮ বিলে ৩১-৮-৯৭ থেকে ১৫-১২-৯৮ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া হিসাবে ৯২৩/৩১ টাকা অতিরিক্ত দাবী করা হয়। পূর্বে নিয়মিত পরিশোধ করা বিল সমূহের ফটোকপি সহ ৭-১-৯৯ তারিখ বিলটি সংশোধনের জন্য আবেদন দাখিল করে ডেসার জনৈক প্রভাবশালী সদস্যকে দিয়ে তদবির করানো হয়। কিন্তু কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি। অতঃপর ডিসেম্বর'৯৮ এর বিল পাওয়া গেলে তা পরিশোধ করা হয়। জানুয়ারী'৯৯ বিলে পুনরায় ৩১-৮-৯৭ থেকে ৭-২-৯৯ পর্যন্ত ১২৭২/৯২ টাকা বকেয়া দাবী করা হয়। সংশোধন করে দেয়ার আশ্বাস পেয়ে তার ফটোকপি ডেসার উল্লেখিত সদস্যকে প্রদান করা হয়। কিন্তু সংশোধনীর পরিবর্তে ঈদের বোনাস হিসাবে ২৮-৩-৯৯ তারিখে প্রদত্ত ফেব্রুয়ারী'৯৯ বিলে মিটার রিডিং ৮২৭৪ এর পরিবর্তে ৮৮৭৮ দেখিয়ে ৬০৪ ইউনিটের জন্য ১৭৪২/৭১ টাকা দাবী প্রদর্শিত হয়। উল্লেখ্য যে বিলটি প্রদানের দিন অর্থাৎ একমাস পরে সর্বশেষ মিটার রিডিং নোট করা হয় ৮৬৫৯। বিষয়টি ঐ দিন বিল দিতে আগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা

করা হলে তিনি জানান যে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একজন ছাত্র। প্রকৃত মিটার রিডার কিভাবে গত মাসের রিডিং নিয়েছেন তা তার জানা নেই বা এ বিষয়ে তার কিছুই করণীয় নেই। এসব বিষয় অবহিত করে গ্রাহক ০১-০৪-৯৯ তারিখ সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগকে একটি আধা-সরকারী পত্র দেন প্রতকার চেয়ে। মাস খানেক পরে খোঁজ নিয়ে উক্ত পত্রের হদিস মন্ত্রণালয়ে না পেয়ে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) কে একটি অনুলিপি প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় ১৫-৬-৯৯ তারিখের এক পত্রে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রহনের জন্য তা ডেসার চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করে। ডেসা কর্তৃপক্ষ তা তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করে। এর পরে সে সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

ইত্যবসারে ডেসার প্রভাবশালী সদস্যের মাধ্যমে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী'৯৯ এর যথাক্রমে ২০০ ও ২০৪ ইউনিটের সংশোধিত বিল পাওয়া গেলে ০১-৫-৯৯ তারিখে তা পরিশোধ করা হয়। মার্চ'৯৯ বিলে পুনরায় বকেয়া সমেত ৩৭৯৭/- টাকা দাবী দেখানো হলে তা ডেসার পূর্বোক্ত সদস্যকে দেখানো হয়। তিনি সেটা নিয়ে সংশোধন করিয়ে দেন যাতে ৩৮১ ইউনিটের জন্য ৩৯৬ টাকার দাবী ৩১-৫-৯৯ তারিখে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এপ্রিল'৯৯ মাসের বিলে পুনরায় ০৪-৫-৯৯ থেকে ০৪-৫-৯৯ সময়ের ভৌতিক বকেয়া ২২৪১/৯৩ টাকা সমেট মোট ২৯৭৫/- টাকা দাবী করা হয়। ডেসার পূর্বোক্ত সদস্যকে তা সংশোধনের জন্য প্রদান করা হয়। কিন্তু সংশোধিত বিল পাওয়া যায়নি। মে'৯৯ বিল সঠিক প্রতীয়মান হওয়ায় তাৎক্ষনিক প্রদান করা হয়। জুন'৯৯ বিলে পুনরায় ০৪-৫-৯৯ থেকে ১১-৭-৯৯ সময়ের অগ্রিম বকেয়া ১৭১৫/৩৫ টাকা সমেত মোট ২৩৩১/- টাকা দাবী করা হয়। পরে বকেয়া বাদ দিয়ে সংশোধিত বিল পরিশোধ করা হয়। জুলাই - আগষ্ট'৯৯ বিল সঠিক প্রতীয়মান হওয়ায় তাৎক্ষনিক পরিশোধ করা হয়। সেপ্টেম্বর'৯৯ বিলে ৪-৫-৯৯ থেকে ২৪-১০-৯৯ বিলে (৪৩৮ - ৫৫৮ মিটার রিডিং) মাত্র ১৬/- টাকার দাবী পরিশোধ করা হয়। সেপ্টেম্বর'৯৯ মাসের উচ্চতর মিটার রিডিং -১২৪০ বিল বিধায় অক্টোবর - নভেম্বর দুই মাসে মাত্র ২৯৮ ইউনিটের ব্যবধান থাকে যার বিল বার বার অনুরোধ করেও অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী'২০০০ বিল যথাক্রমে ১৮২ ও ২৫০ ইউনিটের জন্য তাৎক্ষনিক পরিশোধ করা হয়। কিন্তু মার্চ'২০০০ বিলে ০৪-৫-৯৯ থেকে ২৬-৪-২০০০ পর্যন্ত ২২৫০/৮৯ টাকা বকেয়া সহ মোট ৩৮৪৮ টাকা দাবী করা হয়। বিলটি পুনরায় ডেসার অন্য প্রভাবশালী সদস্যের নিকট নিয়ে গেলে সংশোধিত ২২০ ইউনিটের বিল দেয়া হয়। এপ্রিল'২০০০ বিলটিতে বকেয়া ৩৪০৩/১১ টাকা লিখে পুনরায় কেটে দিয়ে ২৩০ ইউনিটের হাল বিল দিলে তা তাৎক্ষনিক পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য যে গ্রাহক নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। ডেসার একাধিক সদস্য ও পরিচালক এবং বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম-সচিবগণ

তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সচিবও খুবই পরিচিত। তা সত্বেও তাকে এরূপ হেনস্তা হতে হলে সাধারণ গ্রাহকদের অবস্থা কি ?

(গ) উদাহরণ-তিনঃ এন্টি চার্টার

ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ করুন। বিমান টিকেটের প্রথম অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠায় পঠনযোগ্য (বাংলায়) যাত্রীদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছে যে -

১। ফ্লাইটের নির্দিষ্ট সময়ের ২৪ ঘন্টা পূর্বে কনফার্মড টিকেট বাতিল করিলে সার্ভিস/ডকুমেন্টশন চার্জ বাবদ ৪০/- টাকা আদায়যোগ্য।

২। ওপেন ডেটেড অথবা রিকুয়েষ্টে ইস্যূকৃত টিকিটের মূল্য ফেরত নেয়ার সময় অথবা কোন টিকেট রি-ইস্যু করার সময় সার্ভিস/ডকুমেন্টেশন চার্জ বাবদ ২০/- টাকা আদায়যোগ্য।

৩। নির্ধারিত ফ্লাইটের সময়ের ১২ ঘন্টা পূর্বে টিকিট বাতিল করিলে বাতিল ফিস ভাড়ার শতকরা ২৫ ভাগ।

৪। নির্ধারিত ফ্লাইটের সময়ের ৬ ঘন্টা ও কম সময়ের মধ্যে টিকিট বাতিল করিলে বাতিল ফিস ভাড়ার শতকরা ১০০ ভাগ।

৫। নির্ধারিত ফ্লাইটের সময়ের ৬ ঘন্টা ও কম সময়ের মধ্যে টিকিট বাতিল করিলে বাতিল ফিস ভাড়ার শতকরা ১০০ ভাগ।

৬। ফ্লাইট পরিবর্তন অথবা বাতিলের জন্য বিমানের বিক্রয় কাউন্টারে অবশ্যই টিকেট পাঠাতে হবে। কোন অবস্থাতেই টেলিফোনে বাতিল বা পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়।

এটি চার্টার না এন্টি চার্টার ?

শেষ অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠায় পাঠের অযোগ্য সাইজে চুক্তির শর্তাবলীর যে বর্ণনা আছে তাতে আইন কানুনের রেফারেন্সের মাধ্যমে যাত্রীদের হাইকোর্ট দেখানো ছাড়াও ডেমারেজ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ আছে। তবে ক্ষতির পরিমান যাই হোক না কেন ডেমারেজ দেয়া হবে বিমান ঘোষিত নির্দিষ্ট হারে ও পরিমানে। উপরন্ত ক্ষতিপূরণ পেতে হলে একজন যাত্রীকে পুলসুরাত পার হতে হবে। এটা পার হতে পারলে তো ক্ষতিপূরণ পাবেন ! এ ছাড়াও বিমান কর্তৃপক্ষ হাজার প্রকারের যে কোন একটিতে যদি প্রমান করতে পারে যে তাদের কাজে অবহেলা ছিল না তা হলে আর পায়কে । ঢাকা বিমান বন্দরের চুরি, তছরুপ, ছিনতাই, আছাড়ি-পিছাড়ি করে জিনিষপত্র ভাংচুরের প্রতিকার অদ্যাবধি কেউ পেয়েছে বলে জানা যায়নি। বরং সকল রকম জোরাবুলিও স্বেচ্ছারিতার নিকট আত্মসমর্থনে বিলম্ব বা অনীহার কারনে বাবা-মা প্রদত্ত জীবনটা তাদের হাতে তুলে দিতে হয়েছে এরুপ নজির রয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি উদাহরণ থেকে বাংলাদেশের অফিস, সুশীল সেবক ও সার্ভিস সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার প্রেক্ষিতে আমার তিনটি প্রশ্নঃ

১। বিভিন্ন অফিস আদালতে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ সরকারী অঙ্গীকার ও অংশগ্রহণ সম্ভব কি ?

২। সিটিজেন চার্টার প্রকৃতপক্ষে জনগণের ক্ষমতা ও পছন্দের স্বীকৃতি। জনগণের নিকট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনকালীন অঙ্গীকার, করদাতারদের অর্থের মূল্য প্রদান - এক কথায় গণতন্ত্রের পূর্নবাস্তবায়ন সম্ভব চার্টার প্রবর্তনের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সামরিক - আধা-সামরিক - বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বাধা অতিক্রম করে এবং দেশী বিদেশী কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধাচারন উপেক্ষা করে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের ঝুঁকি নেয়ার স্বদিচ্ছা ও সৎসাহস সরকারের হবে কি ?

৩। অনেক ভাল জিনিষ এদেশে ঘোষিত হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। ঘোষিত সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হবে একটি সহজ, স্বচ্ছ, দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও সফল বাস্তবায়ন। বর্তমান মানসিকতার সুশীল সেবক ও সংস্থা কাঠামোর মধ্যে তা সম্ভব হবে কি ?

উপরের তিন প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক না হলে সিটিজেন চার্টার অন্যান্য বহু ভাল আইন কানুনের মতই একটি প্রহসনে পরিনত হবে। জনগন ও দেশ সেই তিমিরেই অবস্থান করবে। পরপর তিনজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার, জন মেজর ও টনি ব্লেয়ার তাদের পুর্বতন - ধাপ ও সিটিজেন চার্টার সমেত সকল সংস্কার কর্মসূচীকে স্বাগত জানিয়েছেন, ক্রমাগত ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং নিয়মিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্ভিস প্রধানগণ পূর্নাঙ্গ সহযোগিতা যুগিয়েছেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ও সিভিল সার্ভিস প্রধানের অঙ্গীকার সংস্কারকে বৈধতা দিয়েছে ও উদ্দীপনা বজায় রাখার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এখনও অগণতান্ত্রিক মন-মানসিকতা ও আচরণ আচ্ছাদিত। আমলাতন্ত্র ঔপনিবেশিক নিগড় ছিন্ন করে দেশ প্রেমিক সুশীল সেবকের সাবলীল শব্দ মালার অনায়াস রুপান্তর ঘটাতে পারেনি। এমনকি ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বকে বৈধ বলে মেনে নেয়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। কার্য সম্পাদনের সঙ্গে বেতন-ভাতা সম্পর্কিত না থাকার কারনে এবং স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি পরায়নতা সুপ্রশস্ত বিধায় কোন কাজই সময়মত সম্পাদিত হয়না, হয়না এর মান রক্ষা। লাল ফিতার দৌরাত্ব সম্পর্কে ব্যাপক সমালোচনার মুখে অফিস আদালতের নথি থেকে লালফিতা অপসারণ করে সাদা ফিতা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে প্রায় - দেড় শতক হবে। কতিপয় অফিসের নাম পরিবর্তন করে (যেমন Directorate of Industries হয়েছে BOI)

সরকারী নিয়ন্ত্রণমূলক আচরনকে (Regulatory functions) উন্নয়ন সহায়ক (Promotional) কার্যক্রমে রুপান্তরিত করার ঘোষণা জারী হচ্ছে জোরে সোরে। কিন্তু তার ফলে ছোট, বড়, মাঝারি কোন আমলার আচরনে কোন মৌলিক পরিবর্তন এসছে, কাজে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে এমন নজির কদাচিত পাওয়া দুস্কর। এ অবস্থার সঙ্গে গরীবি হটাও প্রোগ্রামসমূহ দ্বারা গরীবের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা ক্ষেত্রে সেসন জট, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির অভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি, ইত্যাদি হতাশা, চাদাবাজি ও সন্ত্রাস সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে পরিনত হয়েছে। (জুন ১৫, ২০০০) দৈনিক প্রথম আলোর এক খবরে প্রকাশ "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়া দুটি মৃত্যু পরোয়ানা পেয়েছেন। একজন ছাত্র ১৯৯৫ সালের অনার্স পরীক্ষায় ফেল করে ফল পুনঃ যাচাইয়ের আবেদন করে। কিন্তু অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে ক্ষুব্ধ আলম ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফলাফল না পেলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে হত্যা করবে জানিয়েছে।" আলম অত্যন্ত গর্হিত হুমকি প্রদান করেছে বলে আমরা তাকে নিন্দা করতে পারি। সেই সঙ্গে বড়ুয়া বাবুকে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি একজন করদাতা নাগরিক, ফি দেয়া ছাত্র হিসাবে আপনার কাছে প্রত্যাশা কি ? বিগত ৫/৬ বছরে একটি ছাত্রের আবেদন নিস্পত্তি না করে এবং তাকে তা না জানিয়ে আপনারা কি কোন অপরাধই করেননি ? যদি করে থাকেন আপনার বিচার কি হওয়া উচিত ? ধরুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অতি সাদামাঠা একটি সিটিজেন চার্টার প্রবর্তন করেছে। যেখানে বলা হয়েছে -

১। সকল পরীক্ষা সময় মত অনুষ্ঠান করা হবে। পরীক্ষা শেষ হবার তিন মাসের মধ্যে ফলাফল ঘোষনা করা হবে।

২। ফলাফল ঘোষনার ১৫দিনের মধ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মার্কসিট পৌঁছানো হবে।

৩। যে কোন ছাত্র বা অভিভাবক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি বা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

৪। অভিযোগ দাখিলের এক মাসের মধ্যে তা নিস্পত্তি করা হবে এবং পরবর্তী ১৫দিনের মধ্যে তা অভিযোগকারীকে অবহিত করা হবে।

৫। সকল কর্মে ন্যায় বিচার ও পক্ষপাতহীনতার প্রতিফলন নিশ্চিত করা হবে।

৬। উপরের (১) - (৫) শর্তের কোন ব্যত্যয় ঘটলে যথোপযুক্ত ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হবে। এরুপ অবস্থায় বড়ুয়া বাবুরা কি করবেন ? ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওলিয়া ঘোষনা করবেন না সার্ভিস গুন মান গতি উন্নীত করার চেষ্টা করতে বাধ্য হবেন। সারা দুনিয়ায় নাগরিক অধিকার ও কাষ্টমার সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ যখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি জমাচ্ছে আমরা তখন বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজে আর কত কাল কাটাবো। সময় এসেছে সিটিজেন চার্টার প্রদানের মাধ্যমে

প্রতিটি সিভিল সার্ভিসে সময়মত সঠিক কর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করা। অথবা কাষ্টমারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

১০। তাকানো যাক ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার প্রতি। ১৯৯৭-৯৮ সনে তাদের পাসপোর্ট এজেন্সি ৫০ লক্ষ পাসপোর্ট ইস্যু করেছে। ১৯৯১ সনে এক্সেকিটিভ এজেন্সি গঠনের পূর্বে গড়ে ৯৫ দিন সময় লাগতো। বর্তমানে গড়ে ১০দিন সময় লাগে আবেদন দাখিল থেকে পাসপোর্ট হাতে পেতে। আবেদন দাখিলের জন্য কাউকে পাসপোর্ট অফিসে যেতে হয় না এবং সেটা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় না। পোষ্ট অফিস, ব্যাংক, পর্যটন বা ট্রাভেল এজেন্সীতে দরখাস্ত জমা দিয়ে দিলে পাসপোর্ট দিব্যি বাসায় পৌছে যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে মাত্র ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই পাসপোর্ট ইস্যু হতে পারে। এজেন্সি গঠনের ফলে দক্ষতা বেড়েছে ২৫% এবং জনপ্রিয়তা ৯৮%। ৮০% আবেদন হচ্ছে পোষ্টালে। ১০ বছর মেয়াদী একটি পাসপোর্টের জন্য ফি নেয়া হয় ২১ পাউন্ড। এসব কথা হচ্ছিল পাসপোর্ট এজেন্সির প্লানিং ম্যানেজার Mr. Leslie P.W. Sommer - এর সঙ্গে (২৫-৫-৯৯ তারিখ সকাল ১১টায়) সিভিল সার্ভিস কলেজের অফিসে বসে। এরপর কথা বলার সুযোগ হয় Adjudicator's Office প্রধান Mr. Mike Savage - এর সঙ্গে। তিনি জানালেন ভুল, বিলম্ব, অপ্রতুল ও বিভ্রান্তিকর উপদেশ এবং কর্মীদের আপত্তিকর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়ে থাকে তার এজেন্সির নিকট। গত বছর এরুপ ১১০০০ অভিযোগ পাওয়া গেছে টেলিফোনে। তারা অভিযোগ বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজনে প্রমানাদি নিয়ে রায় প্রদান করে থাকেন। প্রদত্ত প্রতিকারের মধ্যে রয়েছে ক্ষমা প্রার্থনা, খরচ প্রত্যার্পন, শান্তনামূলক অর্থ প্রদান, কর মওকুফ, ইত্যাদি। তিনি জানালেন সিটিজেন চার্টারের ভিত্তিতে তার এজেন্সী এ কাজ করে থাকে। তার এজেন্সী গঠন ও রায় - মেনে নেয়ার জন্য কোন আইন ও আদেশ সরকার জারি করেনি। তথাপি কোন ব্যক্তি বা অফিস তাদের আদেশ অমান্য করেছে এ ধরণের ঘটনা তাদের জানা নেই। আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে এ ধরণের এজেন্সির অস্বিত্ব ও কার্যকারিতা কল্পনা করাও পাগলের প্রলাপ মনে হবে। সুতরাং সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন কিভাবে হতে পারে? যেখানে মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে সংস্থার প্রায় সকল কতৃত্বপূর্ণ কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সত্বেও একজন পদস্থ আমলাকে বছরের পর বছর ভুয়া বিল প্রদানের মাধ্যমে হয়রানী করা হয় এবং তার অভিযোগের তদন্ত পর্যন্ত অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না সেখানে সাধারণ কাষ্টমার প্রতিকার পাবে এটা আশা করা যায় কি ? আর যদি না যায় তাহলে কি কারনে চার্টারে উল্লেখিত সার্ভিস ও মান বজায় থাকবে ? সুতরাং আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে বৃটিশ সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নে পরবর্তী ধাপ ব্যবস্থাপনায় বেসরকারীকরণ পলিসি সমন্বয় করে প্রথমতঃ এটা বন্ধ করে দেয়া যায় কিনা; দ্বিতীয়তঃ যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে বেসরকারী করণ সম্ভব কিনা এবং তার কোনটা সম্ভব না হলে অবশেষে এক্সিকিউটিভ এজেন্সি গঠনের

মাধ্যমে পরিচালনার কথা ভাবতে হবে। অর্থাৎ ডেসা, পিডব্লিউডি, এসওইস, সরকারী পরিবহন পুল, ইত্যাদি শ্বেতহস্তীগুলিকে প্রথমতঃ চেষ্টা করতে হবে বন্ধ করে দিয়ে বিকল্প পন্থায় উক্ত সংস্থার সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা করা। সেটা সম্ভব না হলে আপ্রান চেষ্টা করতে হবে এগুলো যত সত্বর সম্ভব বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া। এবং সেটাও সম্ভব না হলে পরবর্তী প্রথম সুযোগেই বেসরকারী করণের মানসিকতা নিয়ে এজেন্সি গঠনের মত কিছু একটা করতে হবে যা বেসরকরী ব্যবস্থাপনারই নামান্তর মাত্র। প্রশাসনিক সংস্কারের সঙ্গে বেসরকারীকরণ সম্পৃক্ত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার কৌশল হিসাবে। এর ফলে কর্মী ও কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এরুপ স্টেকহোল্ডারদের বাধার সম্মুখীন হতে হবে হয়তো। এরুপ বাধা অতিক্রম করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিভিল সার্ভেন্ট ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ও অভীপ্সা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থন হারানো আশঙ্কা বা আন্দোলনের ভয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পশ্চাদপসরনের উপকরণ বা উপসর্গ হিসাবে কাজ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে ভুলে গেলে চলবে না যে ডেসার বর্তমান কর্মী সংখ্যা তিন হাজারের মত। কিন্তু অফিসিয়াল গ্রাহক ছয় লক্ষাধিক হলেও প্রকৃত গ্রাহক অনেক বেশী এবং বিদ্যুতের সুবিধাভোগী লোকের সংখ্যা ৬০/৭০ লক্ষ। এরা, এমনকি অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা সুবিধা গ্রহণকারীগণও যে কোন চরম ব্যবস্থা গ্রহণে খুশী হবে অত্যন্ত সঙ্গত কারনে। তাছাড়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ নিহিত রয়েছে এ সংস্কার কাজে। সুতরাং এটাই উত্তম, এটাই করণীয়। এ কাজে পিছপা হলে জাতি হিসাবে আমরা পিছিয়ে যাব। সিটিজেন চার্টার প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিটি সরকারী সংস্থায় কাজের সময়ানুবর্তিতা, যথার্থতা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে তা সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে। বেসরকারী সংস্থা নিজের প্রয়োজনেই খরিদ্দার সন্তুষ্টি এজেন্ডা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং উন্নতির মৌলিক শর্ত হিসাবে নিজের গরজেই লিখিত বা অলিখিত চার্টার প্রবর্তনে বাধ্য হবে। ভাল সরকার পরিচালনার (Good Governmnt) স্বীকৃতী স্বরুপ সরকারী ও বেসরকারী উভয় সেক্টরে সিটিজেন চার্টার প্রবর্তনের জন্য কাল বিলম্ব না করে ব্রিটিশ ধাচে সংসদে একটি শ্বেতপত্র পেশ করা যেতে পারে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি বাস্তবায়ন সেল গঠন করা যেতে পারে। বিকল্পে জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনের (২৮ নং) প্রস্তাব অনুসারে PARMOC গঠন করা যেতে পারে। সুতরাং এ মুহুর্তে আমাদের স্লোগান হোক -

"সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন চাই।
সিটিজেন চার্টার ছাড়া গতি নাই।"

তথ্য নির্দেশিকা

Annual Report (1998). The Adjudicator's Office, Haymarket House, 28 Haymarket, London, SWIY 4SP.

The Civil Service College Library (1991), Sunningdale Park, UK: The Citizen's Charter.

The Civil Service College Library (1991), Sunningdale Park, UK: A Report on Next Steps.

The Civil Service College Library (1968), Sunningdale Park, UK: The Fulton Committee Report.

The Four Secretaries Report (1993): Towards Better Government in Bangladeh.

IDRH, Organiser Poureussir (1999), 15 rue de la Baume 75008 Paris (Administrative Reform Dhaka Conference, 31 October - 04 November.

MATT Portfolio Group Report (1999): The Performance Appraisal System of the Civil Servants of Bangladesh.

Noella Jorm, Julie Hunt, Nick Manuing (1996): Working Towards Results, Managing Individual Performance in the Puboic Service - Managing The Public Service Strategies for Improvement Series: No. 3: Commonweaflth Secretarial, London.

TheWorld Bank Report (1995): The Government that Works.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

তামাকের শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা

গোলাম মোস্তাকীম*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্পূর্ণ সম্পন্ন করতে হলে কৃষিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তামাক বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসলের অন্যতম। দেশে এবং বিদেশে এর চাহিদা প্রচুর। ভালভাবে তামাক উৎপাদন করে এবং সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের দেশের গরীব চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন করা যেতে পারে। এ প্রতিবেদনের লক্ষ্য হল কৈপাল গ্রামের তামাক উৎপাদনের সুবিধা এবং বিশেষ করে বিপণন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান শোষণ প্রক্রিয়া তুলে ধরা এবং এই সমস্যার সমাধানকল্পে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ প্রতিবেদন কোটা কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গ্রামীণ সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য কোটা প্রশিক্ষণার্থীকে চার সপ্তাহ গ্রামে থেকে গ্রামের কোন একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা ও আলাপ-আলোচনা করতে হয়েছে এবং পরিশেষে সমস্যার সমাধানের জন্য সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

২। পদ্ধতি

গ্রামীণ জীবনকে জানার জন্য কোটা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪০টি প্রশ্নমালা সরবরাহ করেন। কোটা প্রদত্ত প্রশ্নমালা এবং প্রতিবেদনের জন্য তৈরী সম্পূরক প্রশ্নমালা-১ এর ভিত্তিতে কৈপাল গ্রামের ৪০টি পরিবার প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মূলতঃ এই সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদনের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। দৈবচয়ন বা র‍্যানডম স্যামপ্লিংয়ের দ্বারা এই ৪০টি পরিবারকে বেছে নেয়া হয়। এ ছাড়া তামাকের বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে থানা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী, তামাক ব্যবসায়ী, স্থানীয় বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক এবং তামাক চাষের সঙ্গে জড়িত অনেকের সঙ্গে সাধারণভাবে এবং ঘরোয়াভাবে এবং ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ আলোচনা করা হয়। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলাপ করা হয়। উপরন্ত তামাকের মূল্য সম্পর্কে কৃষকদের মতামতকে যাচাই করার জন্য প্রতিবেদক স্বয়ং দৌলতপুর থানার আল্লাহর দরগায় অবস্থিত বাংলাদেশ টোব্যাকো কোঃ লিঃ এর তামাক ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে বিটিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তামাকের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিরীক্ষা করেন।

*পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

তামাকের বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে বিটিসি এবং তামাক উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করা হয়েছে।

৩। সীমাবদ্ধতা

এ প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য যতটা খোঁজ-খবর করা উচিত ছিল প্রতিকুল আবহাওয়া এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য প্রতিবেদকের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। মূলতঃ তামাক চাষীদের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন রচনা করা হয়েছে।

৪। গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৪.১ কৈপাল কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত মথুরাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এ গ্রাম মানচিত্রে মাইজদিয়া নামে উল্লিখিত আছে। থানা কেন্দ্র থেকে এ গ্রামের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। কৈপাল গ্রামের পূর্বে শালিমপুর, উত্তরে চাঁইপা । এখানে শুধুমাত্র দুটি মসজিদ এবং দুটি কৃষক সমবায় সমিতি আছে । কৃষক সমবায় সমিতির নেতৃত্বে আছে ধনী চাষী। গ্রামে কোন পুকুর নেই। একটি কৃষক সমিতির ব্যবস্থাধীনে দুটি পাওয়ার পাম্প চালু আছে। তবে তাতে গ্রামের সাধারণ চাষীর কোন উপকার হয় না। কারণ ঐ পাওয়ার পাম্প দুটিতে এই গ্রামের বিশেষ একজন লোকের জমিতেই বেশী সেচের কাজ হয়। গ্রামে গণশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। শুরুতে দুই/একদিন লেখাপড়া হয়েছিল। এখন কোন কাজ হচ্ছে না। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ গ্রামের সাধারণ লোকজন বেশ সচেতন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী এ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মাসে একবার এ গ্রামে এসে দুই একদিন থাকেন। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ লোকই এ ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। সারের অফিস এবং হাসপাতাল সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা খুবই বিরুপ। কোন রকম কৃষি সংক্রান্ত উপকরণ চাষীরা ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারেন না। ৪০টি পরিবারের প্রধানদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বলা যায় যে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গ্রামীবাসী বেশ সচেতন। নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মনোভাব বেশ উদার। গরীব চাষী ভূমি সংস্কারের পক্ষে কিন্তু ধনী চাষী এর খুবই বিরোধী। গ্রাম সরকার সম্পর্কে অধিকাংশ গ্রামবাসীর তেমন কোন উৎসাহ নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কৈপাল গ্রাম সরকার প্রধান একজন বেশ ধনী এবং প্রভাবশালী চাষী। তিনি তামাক ব্যবসাও করেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ চাষীই তার নির্বাচনে সন্তুষ্ট নন। অনেকেই তাঁর কাছে ঝগড়া-বিবাদের বিচারের আশায় গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। গ্রাম প্রধানের বক্তব্য নিজের দলের লোকের বিরুদ্ধে তিনি কোন বিচার করতে পারবেন না। গ্রামের প্রায় শতকরা ৮০ জনই ক্ষুদ্র চাষী এবং দিনমজুর। অন্যান্য ফসলের মধ্যে তামাক এ গ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। কিন্তু কৃষকরা তামাকের জন্য অনেক

পরিশ্রম করেও এর ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। এ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের অনেক অভিযোগ-অনুযোগ প্রতিবেদককে শুনতে হয়েছে। চাষীরা বিশেষ করে তামাক চাষীরা হতাশার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন।

৪.২ কৈপাল গ্রামে বহুবিবাহ প্রচলিত। অনেকেই একাধিক বিবাহ করে থাকেন। বিবাহ বিচ্ছেদের হারও বেশ আশঙ্কাজনক। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে গ্রামবাসীরা যৌতুককেই অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে করেন। প্রায়ই দেখা যায় যে, পূর্বে প্রতিশ্রুত যৌতুক না পেয়ে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে সন্তানসহ তার পিতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে সামাজিক অনাচারের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক অবিচারের কোন প্রতিকার নেই বললেই চলে।

৪.৩ চোরাচালান শব্দটা এখানে বেশ প্রচলিত। কৈপাল গ্রাম থেকে সীমান্ত মাত্র ৮ মাইল। গ্রামবাসীদের ধারণা চোরাচালানের সঙ্গে অনেক প্রভাবশালী লোক জড়িত। তাদের অনেককেই গ্রামবাসীরা চেনেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের বক্তব্য টাকা দিয়ে সব লোককে কেনা যায়।

৪.৪ নিম্নে ৪টি সারণীর মাধ্যমে কৈপাল গ্রামের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারের আয়তন, জমির মালিকানা, পরিবার প্রধানের পেশা এবং শিক্ষার চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণী - ১
পরিবারের আয়তন

সদস্য সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	%
১ - ৩	৫	১২.৫%
৪ - ৬	১৬	৪০%
৭ - ৯	১১	২৭.৫%
১০ - ১২	৬	১৫%
১৩ - ১৫	২	৫%
মোট	৪০	১০০%

সারণী - ২
জমির মালিকানা

জমির পরিমাণ (একর)	পরিবারের সংখ্যা	%
০ - ০	১৬	৪০%
.০১ - .৪৯	৩	৭.৫%
.৫ - .৯৯	৫	১২.৫%
১.০ - ১.৯৯	৪	১০%
২.০ - ২.৯৯	২	৫%
৩.০ - ৩.৯৯	৪	১০%
৪.০ - ৪.৯৯	২	৫%
৫.০ - ৫.৯৯	-	-
৬.০ - ৬.৯৯	-	-
৭.০ - ৭.৯৯	২	৫%
৮.০ - ৮.৯৯	১	২.৫%
৯.০ - এবং উর্ধ্বে	১	২.৫%
মোট	৪০	১০০%

সারণী - ৩
পেশার ভিত্তিতে পরিবার প্রধান

পেশা	পরিবার প্রধানের সংখ্যা	%
কৃষক	১৮	৪৫%
দিনমজুর	১৬	৪০%
রিক্সাচালক ও ভ্যানগাড়ী চালক	২	৫%
রাজমিস্ত্রি	২	৫%
ব্যবসায়ী	১	২.৫
শিক্ষকতা	১	২.৫%
মোট	৪০	১০০%

সারণী - ৪
পরিবার প্রধানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবার প্রধানদের সংখ্যা	%
নিরক্ষর	৩২	৮০%
১ম - ৫ম	৩	৭.৫%
৬ষ্ঠ - ১০ম	২	৫%
এস.এস.সি - এইচ.এস.সি	২	৫%
এইচ.এস.সি - এম.এ	১	২.৫%
মোট	৪০	১০০%

৪.৫ উদ্বৃত ৪টি সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪০টি পরিবার প্রধানের মধ্যে ৮০% ভাগ নিরক্ষর। ১নং সারণী থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ৪ - ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। তাদের সংখ্যা ৪০%। তারপর ৭ - ৯ জন নিয়ে গঠিত পরিবারের সংখ্যা। তাদের সংখ্যা শতকরা ২৭.৫ ভাগ। ১ - ৩ জন নিয়ে গঠিত পরিবারের সংখ্যা শতকরা ১২.৫ ভাগ। ২নং সারণী থেকে দেখা যায় যে কৈপালে ৪০ জন পরিবার প্রধানের মধ্যে ১৬ জনের চাষযোগ্য কোন জমি নাই। অর্থাৎ তারা ভূমিহীন। এর থেকেই দেখা যায় যে, দারিদ্র সেখানে কতটা প্রকট। সারণী থেকে আরও দেখা যায় যে কৈপালের ৪০টি পরিবার প্রধানের মধ্যে ৩০ জনের জমির পরিমাণ ৩ একরের উপরে নয়। ৩নং সারণী থেকে দেখা যায় যে কৃষক এবং দিনমজুরের সংখ্যা শতকরা ৮৫ জন। এবং এদের অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নিম্নে অবস্থান করে। ৪নং সারণী থেকে কৈপাল গ্রামের শিক্ষা সম্পর্কে একটা সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। পরিবার প্রধানদের মধ্যে শতকরা ৮০ভাগই নিরক্ষর। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাদের যথেষ্ঠ উৎসাহ রয়েছে। গণশিক্ষার ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। গণশিক্ষার জন্য কৈপালে কার্যতঃ কোন ব্যবস্থা নেই।

৫। তামাক চাষের ইতিহাস

১৯৬৭ সালের পূর্বে কৈপাল গ্রামে কোন তামাক চাষ হতো না। বাংলাদেশ টোব্যাকো কোং এখানে তামাক চাষ প্রচলনের জন্য কৃষকদের নানাভাবে উৎসাহিত করে। কোম্পানী কৃষকদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে। কৃষকরা আস্তে আস্তে তামাক চাষ শুরু করেন। বিটিসি চাষীদের মধ্যে কার্ডের

ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু অর্থের লোভে যে সকল চাষীর কার্ড নেই তারাও তামাক চাষ করেন। ফলে তামাকের বাজারে চাষীরা কোম্পানীর কাছে তামাকের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। এখন কৈপাল গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই তামাক চাষ করেন। প্রতি বছরই তারা মনে করেন যে, তামাকের ন্যায্য মূল্য পাবেন। কিন্তু পান না। এতে মনে হয় কৈপালের কৃষকরা 'মানি ইলুশনে' ভুগছেন। মাত্র ১৯৭৪-৭৫ সালে দৌলতপুর তথা কৈপালের চাষীরা তামাকের ন্যায্য মূল্য পেয়েছিলেন।

৬। তামাক উৎপাদন

৬.১ তামাকের চাষ ব্যয়বহুল এবং এতে প্রচুর শ্রম ও যত্নের দরকার হয়। কার্তিক অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন - চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রায় ৪/৫ মাস তামাক চাষের জন্য ব্যয় করা হয়। এ ফসল চাষের জন্য অনবরত যত্নের প্রয়োজন হয় এবং একটু অযত্ন হলে কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে তামাকের মান কিংবা মাঠের সকল ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৬.২ নীচে ৫নং সারণীর মাধ্যমে কৈপাল গ্রামের চাষীদের তামাকের জন্য ব্যবহৃত আবাদী জমির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণী - ৫
কৈপাল গ্রামে তামাক চাষে ব্যবহৃত আবাদী জমি

মোট আবাদী জমির পরিমাণ (একরে)	তামাক চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি (একর)	%
৯৩	২৯.৮৩	৩২%

২০জন চাষীর মোট জমি থেকে সারণী করা হয়েছে।

৬.৩ কৈপাল গ্রামে ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ হয়। এক বিঘা জমিতে তামাকের উৎপাদন খরচ ৬নং সারণীতে দেখানো হলোঃ

সারণী - ৬

এক বিঘা জমিতে মোট উৎপাদন খরচ

ক্রমিক নং	উৎপাদন প্রক্রিয়া	খরচ (টাকা)	মন্তব্য
১।	জমি চাষ করা	৩৩.০০	-
২।	সার প্রয়োগ	২৬৪.০০	-
৩।	চারা রোপণ	৪২.০০	-
৪।	পানি সেচ	৮২.০০	কয়েক বার পানি সেচ দিতে হয়
৫।	নিড়ানী	৩৫.০০	--
৬।	কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে দেওয়া	৩১.০০	-
৭।	ফসল ঘরে তোলা	১৩২.০০	-
৮।	গ্রেডিং করা	২০.০০	-
৯।	পাতা শুকানো	৮৪৫.০০	এখানেই সবচেয়ে বেশী খরচ করা হয়। পাতা শুকানোর মৌসুমে
১০।	বেল বাঁধা (ব্যাগ ও দড়ি)	২৩.০০	জ্বালানী কাঠের দাম মন প্রতি
১১।	বিটিসি ডিপোতে নেওয়া	৯.০০	(২২-২৫) টাকা পর্যন্ত বেড়ে যায়
১২।	বিবিধ	১০.০০	-
	মোট	১৫৬৬.০০	

উপরের সারণীতে কৃষি উপকরণ এবং শ্রমিকের মজুরী একসঙ্গে ধরা হয়েছে। এক বিঘা জমিতে পাঁচ জন কৃষি মজুর কাজ করে। দৈনিক মজুরী ৭.০০ টাকা + এক বেলা খাবার।*

৬.৪ কৈপালে ১ বিঘা জমিতে গড়ে ৩০০ পাউন্ড তামাক উৎপাদিত হয়। প্রতি পাউন্ড গড়ে ৭ টাকা হিসাবে কৃষক বিক্রয় মূল্য পেয়ে থাকেন। উৎপাদন খরচ বাদ দিলে কৃষক এক বিঘায় উৎপাদিত তামাকে মোট ৫৩৪/- টাকা লাভ করেন। (প্রাপ্ত বিক্রয় মূল্য ২১০০ টাকা - উৎপাদন খরচ ১৫৬৬ টাকা= ৫৩৪/- টাকা)।

৭। উৎপাদন সমস্যা

৭.১ কৈপাল গ্রামের তামাক চাষীরা তামাক উৎপাদনে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৬৭ সালে প্রথমে বিটিসির উৎসাহে এবং সহযোগিতায় তামাক চাষের প্রচলন হয়।

---

*উপরোক্ত খরচের তালিকা স্থানীয় জনাব আফাজউদ্দিন আহমেদ সরবরাহ করেছেন। সময় ১৯৮০-৮১।

তখন তামাকের চাহিদা উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। কাজেই তামাক উৎপাদনের জন্য টোব্যাকো কর্তৃপক্ষ কৃষকদিগকে সম্ভাব্য সকল প্রকারের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করতেন। কৃষকদের মধ্যে কোম্পানী সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এবং কৃষকরা তামাক চাষ করতে শুরু করে। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃষকদের সুযোগ সুবিধার প্রতি কোম্পানীর কোন খেয়াল নেই। নানাভাবে কৃষকরা কোম্পানী দ্বারা শোষিত হচ্ছেন।

৭.২ তামাক উৎপাদনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। অধিকাংশ কৃষকই তা করতে পারেন না। তাদেরকে মহাজন কিংবা ধনী চাষীর কাছ থেকে ঋণ করতে হয়। স্থানীয় কৃষি ব্যাংক থেকে গরীব চাষীরা তেমন কোন আর্থিক সাহায্য পান না।

৭.৩ সরকার কর্তৃক ধার্যমূল্যে কৃষকরা সার কিনতে পারেন না। তাদেরকে কালোবাজার থেকে চড়া দামে সার কিনতে হয়।

৭.৪ কৈপাল গ্রামে তামাক চাষীদের কোন সমবায় সমিতি নেই। যদিও এখানে দুটো কৃষক সমবায় সমিতি আছে কিন্তু কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য তামাকের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

৭.৫ চাষীরা তাদের তামাক বেশীদিন ঘরে রাখতে পারেন না। কারণ এর জন্য তাদের কোন বাড়তি ঘর নেই। দারিদ্র তাদেরকে অনেক পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছে। তাই তামাক বিক্রয়ের মৌসুমে তাঁরা নামমাত্র মূল্যে তামাক বিক্রয় করতে বাধ্য হন।

৮। বিপণন ব্যবস্থা

৮.১ তামাকের বিপণন ব্যবস্থার কথা তুললে প্রথমেই বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানী লিঃ এর কথা বলতে হয়। কৈপাল তথা সমগ্র দৌলতপুরের তামাকের বাজার বিটিসি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে এ নিয়ন্ত্রন সাধারণ ভাবেই শোষণমূলক নিয়ন্ত্রণ। বিটিসির কার্ডধারী তামাক চাষীরা তাদের তামাক বিটিসিকে বিক্রয় করতে মোটামুটি অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রায়ই দেখা যায় বিটিসি যে মূল্য নির্ধারণ করে, তামাক চাষীকে সেই মূল্যেই তামাক বিক্রয় করতে হয়। এ প্রতিবেদক আল্লাহর দরগায় অবস্থিত বিটিসির তামাক ক্রয় কেন্দ্রে নামমাত্র মূল্যে তামাক বিক্রয় হতে দেখেছেন। সেখানে কৃষকদের কিছুই করার নেই। কোন দিকে কার তামাক ক্রয় করা হবে বিটিসি তার জন্য টিপি (ট্রান্সপোর্ট পারমিট) ইস্যু করে থাকে। সকাল এগারটার মধ্যে তামাক ক্রয়কেন্দ্রে হাজির করতে হয়। এর পরে তামাক সাধারণতঃ তামাক ক্রয়কেন্দ্রের ভিতর নেওয়া যায় না। বিটিসির ম্যানেজার সাহেব তাঁর অফিস থেকে ক্রয়কেন্দ্রে আসেন এবং প্রতি বেল তামাকের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। সেখানে কৃষকদের কোন

মতামত গ্রহণ করা হয় না, কৃষকরা কোন প্রতিবাদ করলে তাদের তামাক কেনা হয় না। বিটিসি এটা করতে পারে। কারণ তাদের উৎসাহে কৈপাল তথা দৌলতপুরের চাষীরা চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী তামাক উৎপাদন করে থাকেন। মাঝে মাঝে ক্রয়কেন্দ্রে তামাক চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। গত বছর আল্লাহর দরগায় বিটিসির ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হয়েছিল এবং তিনি দৌলতপুর ছেড়ে কুষ্টিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে গরীব তামাক চাষীদের কোনই লাভ হয়নি। বরং তাদের আরও ক্ষতি হয়েছে। কারণ তাঁদের তামাক তাদের পক্ষে কুষ্টিয়ায় এসে বিক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তামাক ব্যবসায়ীরাই বেশী লাভবান হয়েছিলেন।

৮.২ কৃষকদের প্রতি বিটিসি কর্তৃপক্ষের আচরণ সত্যিই দুঃখজনক। খুব ভোরে তামাক নিয়ে তারা বিটিসি ক্রয় কেন্দ্রে আসেন। সেখানে তাদের কোন বসার জায়গা নেই। এবং কখন যে তাদের তামাক ক্রয় করা হবে সে নিশ্চয়তাও কেউ তাদের দিতে পারে না। বিটিসি নিয়োজিত শ্রমিকদের ব্যবহারও ভাল নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কৃষক নামমাত্র মূল্যে বিটিসিকে তামাক বিক্রি করতে বাধ্য হন। কারণ দিনের শেষে তার পক্ষে সম্ভব হয় না সেই তামাক তাঁর বাড়ীতে ফিরিয়ে নেওয়া।

৮.৩ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য বিটিসি অনুসরন করে বলে মনে হয় না। মূল্য নির্ধারণ সম্পূর্ণ তাদের খেয়াল মাফিক করা হয়। সরকারের নির্দেশ অনুসারে বিটিসির ক্রয়কেন্দ্রে গ্রেড অনুসারে তামাকের নমুনা রাখার কথা। কিন্তু বিটিসি কর্তৃপক্ষ সে রকম কোন তামাকের নমুনা রাখা বিন্দুমাত্র প্রয়োজন মনে করেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে অনেক আবেদন নিবেদন করেও কোন ফলোদয় হয়নি। কোন কৃষক মূল্য নির্ধারণে প্রতিবাদ করলে বিটিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ড বাতিল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এবং কৈপাল গ্রামের কয়েকজন চাষীর কার্ড এই প্রতিবাদ করার কারণেই বাতিল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এটা বিটিসির একটা মারাত্মক হাতিয়ার। বিটিসির ক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থাকলে শুধু একটি কথাই মনে হবে সিগারেট বিক্রি করতে কোন দুর্যোগ পোহাতে হয় না। কিন্তু যারা তামাক উৎপাদন এবং বিক্রি করেন তাদের দুর্ভোগের কোন সীমা নেই।

নিম্নের ৭নং সারণীতে সরকারের নির্ধারিত মূল্য এবং বিটিসি কর্তৃক ক্রয়মূল্যের পার্থক্য দেখানো হলোঃ

সারণী - ৭

ক্রমিক নং	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য 'ক'	বিটিসি কর্তৃক ক্রয় মূল্য 'ক'	শতকরা হিসাবে মূল্য কম প্রাপ্তি	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য 'খ'	বিটিসি কর্তৃক ক্রয়মূল্য 'খ'	শতকরা হিসাবে মূল্য কম প্রাপ্তি	সরকার কর্তৃক ক্রয়মূল্য 'গ'	বিটিসি কর্তৃক ক্রয়মূল্য 'গ'	শতকরা হিসাবে মূল্য কম প্রাপ্তি
১	১৫.০০	৮.৫০	৪৩%	১৩.০০	৬.৫০	৫০%	১১.০০	৪.৫০	৬০%
২	১৫.০০	৭.৫০	৫০%	১৩.০০	৪.৫০	৬৫%	১১.০০	-	-
৩	১৫.০০	৮.০০	৪৬%	১৩.০০	৫.৫০	৫৭%	১১.০০	৫.০০	৬৪%
৪	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
৫	১৫.০০	৮.০০	৪৬%	১৩.০০	৫.০০	৬১%	১১.০০	৪.০০	৬০%
৬	১৫.০০	৫.৫০	৬৩%	১৩.০০	৪.৫০	৬৫%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
৭	১৫.০০	১০.০০	৩৩%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৪.০০	৬৩%
৮	১৫.০০	৭.৫০	৫০%	১৩.০০	৫.৫০	৫৭%	১১.০০	৮.০০	২৭%
৯	১৫.০০	--	--	১৩.০০	৯.৫০	২৬%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
১০	১৫.০০	১০.০০	৩৩%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৫.৫০	৫০%
১১	১৫.০০	৯.০০	৪০%	১৩.০০	৭.০০	৪৬%	১১.০০	--	--
১২	১৫.০০	১২.০০	২০%	১৩.০০	১০.০০	২৩%	১১.০০	৪.৭০	৫৭%
১৩	১৫.০০	৯.০০	৪০%	১৩.০০	-	-	১১.০০	৫.৫০	৫০%
১৪	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৭.০০	৪৬%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
১৫	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	৭.০০	৩৬%
১৬	১৫.০০	১১.০০	২৬%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	-	-
১৭	১৫.০০	১৩.০০	১৩%	১৩.০০	৯.০০	৩০%	১১.০০	-	-
১৮	১৫.০০	১৩.০০	১৩%	১৩.০০	-	-	১১.০০	-	-
১৯	১৫.০০	৮.০০	৪৬%	১৩.০০	৭.০০	৪৬%	১১.০০	-	-
২০	১৫.০০	১০.০০	৩৩%	১৩.০০	-	-	১১.০০	-	-

৭নং সারণী থেকে মূল্য নির্ধারণে বিটিসি কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারের একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে। এ সারণী থেকে আরও দেখা যায় যে, পাউন্ড প্রতি ১৫ টাকা মূল্যের তামাকে কৈপালের তামাক উৎপাদনকারীরা শতকরা হিসাবে নির্ধারিত মূল্যের ৩৭ ভাগ কম পান। অনুরুপভাবে পাউন্ড প্রতি ১৩ টাকা মূল্যের তামাকে শতকরা ৪৪ ভাগ এবং পাউন্ড প্রতি ১১ টাকা তামাকে শতকরা ৫০ ভাগ কম পান। এখান থেকে স্পষ্টই বলা যায় যে, বিটিসি শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

এখন দেখা যাক কি কি কারণে এবং কাদের সহায়তায় এ শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা চলছে এবং টিকে আছে।

৯। দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম ও বিটিসি

৯.১ তামাকের শোষণমুলক বিপণন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পিছনে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। তাদের একই লক্ষ্য কি করে আরও বেশী মুনাফা অর্জন করা যায়। দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে অনেক ধনী চাষী ও

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। বিটিসির উপর তাদের প্রভাব অপরিসীম। এরাই তামাকের ন্যায্যমূল্য পেয়ে থাকেন যদিও এদের অনেকেই তামাকের কোন চাষ করেন না।

৯.২ প্রথমেই বিটিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ডের কথা ধরা যাক। নিয়ম অনুযায়ী যারা তামাক চাষ করবেন এ কার্ড শুধু তাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, সত্যিকার তামাক চাষীর কোন কার্ড নেই। আবার দেখা যায় ধনী চাষী ও মধ্যস্বত্বভোগী অন্যদের কার্ড নানা উপায়ে হস্তগত করেন। তারপর তারা বাইরে থেকে তামাক কিনে প্রতি কার্ডের বরাদ্দকৃত তামাক বিটিসি ক্রয়কেন্দ্রে অধিক মূল্যে বিক্রি করেন। এ প্রতিবেদক নিজে দেখেছেন যে, দুই বেলে একই রকম তামাক রয়েছে। কিন্তু এক বেলের পাউন্ড প্রতি তামাকের মূল্য নির্ধারিত হলো ৯ টাকা অন্য বেলের তামাকের মূল্য হলো ১১ টাকা। কার্ডধারী কোন চাষী কার্ড হারানোর ভয়ে বিটিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে তামাক বিক্রয় করতে বাধ্য থাকেন।

৯.৩ তামাক ক্রয় করার মৌসুমে প্রায়ই দেখা যায় যে, ধনী চাষীরা আগে টিপি (ট্রান্সপোর্ট পারমিট - তামাক বিক্রয় করার ছাড়পত্র) পান এবং গরীব চাষীরা পরে পান। এখানেও গরীব চাষীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

৯.৪ সাধারণতঃ মার্চের শুরুতেই বিটিসি তামাক ক্রয় করতে শুরু করে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, বিটিসি তাদের ক্রয়কেন্দ্রে কাজ একটু বিলম্বে শুরু করেছে। এতে গরীব চাষীরা তাদের তামাক ধনী চাষী ও দালালদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এবং স্বভাবতই তারা ন্যায্য মূল্য পান না। সাধারণ চাষীদের বক্তব্যঃ এ রকম বিলম্ব দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থেই করা হয়।

৯.৫ কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে, দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অনুপ্রেরনায় কিছু লোক তামাকের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন শুরু করে। তখন বিটিসি স্বাভাবিকভাবেই তামাক ক্রয় করা বন্ধ রাখে। ইত্যবসরে অভাবের তাড়নায় গরীব চাষীরা তাদের তামাক নামমাত্র মূল্যে এসব দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য হন। শোনা যায়, এ রকম আন্দোলন বিটিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্তি বুদ্ধি করেই করা হয়।

৯.৬ তবে তামাকে সবচেয়ে বেশী লাভ করেন স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সবাই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিটিসি এই সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। এদের তামাক যত খারাপই হোক না কেন সে তামাকের ভাল দাম দিতে হবেই। বছর দুয়েক আগে আল্লাহর দরগায় এক ম্যানেজার বলেছিলেন, "আমি তামাক দেখে দাম দিব। মুখ দেখে নয়"। স্থানীয় কোন এক

রাজনৈতিক নেতা তাঁকে সবার সামনে অপমান করে বিটিসি ক্রয়কেন্দ্র হতে আক্ষরিক অর্থে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৯.৭ একই তামাক বিটিসির ক্রয়কেন্দ্রে মূল্য ৭ টাকা পাউন্ড। গেটের বাইরে দালাল সে তামাক ৮ টাকা পাউন্ড হিসাবে ক্রয় করে আবার বিটিসির কাছে সেই তামাক ১১ টাকা পাউন্ড দরে বিক্রি করছেন। এ দৃশ্য সবার চোখের সামনেই ঘটছে। কিন্তু মনে হয় সবাই অসহায়, কারও কিছুই করার নেই। এমতাবস্থায় সেই দালালের সঙ্গে বিটিসি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। এ ভাবেই দিনের পর দিন কৈপাল তথা দৌলতপুরের তামাক চাষীরা ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৯.৮ বিটিসি ছাড়া অন্য কোন নির্ভরযোগ্য টোব্যাকো কোম্পানী দৌলতপুরে নেই। দৌলতপুর তামাকের বাজারে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর সাহায্যে বিটিসি একচেটিয়া ব্যবসা করে থাকে। অন্যান্য তামাক কোম্পানীর উপর জনসাধারণের কোন আস্থা নেই। বিটিসির একটা গুণের কথা সবাই বলে সেটা হলো, বিটিসি নির্দিষ্ট সময়ে দাম পরিশোধ করে। এ ব্যাপারে তাদের কোন ক্রটি নেই।

৯.৯ স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গরীব চাষীরা তেমন কোন সাহায্য পায় না। এ প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যে গরীব চাষীদের কিছুটা সামর্থ্য থাকলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তারা তাদের তামাক ঘরে রাখতে পারতেন। এতে হয়তো বিটিসির সঙ্গে তারা দরকষাকষি করতে পারতেন। কিন্তু সে রকম কোন সাহায্য তারা ব্যাংক থেকে পান না। অথচ কৈপাল গ্রামের এক ধনী চাষী একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে তিন লাখ টাকা ক্যাশ ক্রেডিট পেয়েছেন। এবং এ ঋণ তিনি পেয়েছেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। তখন এখানে ক্রয় শুরু হয়েছে। এই ভদ্রলোকের ধারণা, তামাক চাষে কোন লাভ নেই, ব্যবসায় লাভ।

১০। সাধারণ চাষীর ভাগ্যোন্নয়ন

তামাক চাষ করে কৈপাল গ্রামের কোন চাষীর তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। নিম্নে গত ১২ বৎসরে কৈপাল গ্রামের ২০জন তামাক চাষীর ভূমি মালিকানা পরিবর্তনের ধারা দেখানো হলোঃ

সারণী - ৮

কৈপাল গ্রামের ২০ জন চাষীর গত ১২ বৎসরের ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের ধারা

ক্রমিক নং	জমির পরিমাণ ১৯৬৭ সাল (একর)	জমির পরিমাণ ১৯৭৪ (একর)	জমির পরিমাণ ১৯৮০ (একর)	মন্তব্য
১।	১৩.৩৩	৬.৬৬	৪	জমি হ্রাস পেয়েছে
২।	.৩৩	.৩৩	.৩৩	-
৩।	-	-	১.৬৬	১৯৭৬ সালে পরিবার থেকে পৃথক হন
৪।	-	-	১	ঐ
৫।	-	-	১.৬৬	১৯৭৯ সালে পরিবার থেকে পৃথক হন
৬।	২.৩৩	২.৩৩	২.৩৩	-
৭।	৩.৩৩	৩.৩৩	৪.৩৩	এক একর জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
৮।	১	১	১	-
৯।	৮.৬৬	৮.৬৬	৮.৬৬	-
১০।	২০	২০	২০	-
১১।	৫.৬৬	৬.৬৬	৮.৩৩	প্রায় তিন একর জমি বৃদ্ধি পেয়েছে
১২।	.১৩	-	.১৩	-
১৩।	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	-
১৪।	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩৩	-
১৫।	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩৩	-
১৬।	২.৩৩	.৬৬	.৬৬	জমি হ্রাস পেয়েছে
১৭।	৩.১৬	৩.১৬	৩.১৬	জমি হ্রাস পেয়েছে
১৮।	৫.৩৩	২.৬৬	২.৬৬	জমি হ্রাস পেয়েছে
১৯।	৮.৩৩	৮.৩৩	৮.৩৩	-
২০।	১	১	.৮৩	জমি হ্রাস পেয়েছে

১১। তামাক উন্নয়ন বোর্ডের ব্যর্থ তদারকী

দৌলতপুর থানায় তামাক উন্নয়ন বোর্ডের এক তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে এ প্রতিবেদকের আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তামাকের শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি সচেতন। কিন্তু তিনি সবিনয়ে জানালেন যে বিটিসি কর্তৃক নির্ধারিত তামাকের মূল্য সম্পর্কে মতামত দেওয়ার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। আলাপে আরও জানা গেল যে তাঁর দ্বারা চাষীর কোন উপকার হচ্ছে না এবং তিনি নিজেও জানেন না

তাঁর প্রকৃত কি কাজ এবং কেন তাঁকে দৌলতপুর রাখা হয়েছে। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, কৈপাল তথা দৌলতপুরে বাংলাদেশ তামাক উন্নয়ন বোর্ডের কোন সক্রিয় তৎপরতা নেই।

১২। তামাক চাষের প্রভাব

১২.১ তামাক উৎপাদনে তামাক শুকানো একটা বেশ বড় সমস্যা। কৈপালে সাধারণতঃ জ্বালানী কাঠ দিয়ে তামাক শোধন করা হয়। অর্থাভাবে অনেক সময় দরিদ্র চাষী তাঁর বাড়ীর ফলের গাছ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এর ফলে কৈপালে গাছের সংখ্যা বেশ হ্রাস পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পরিবেশের উপর এর একটা বিরুপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। বর্তমানে তামাক শোধনের মৌসুমে অন্যান্য জেলা থেকে জ্বালানী কাঠের আমদানী করতে হয়।

১২.২ ব্যাপক তামাক চাষের ফলে কৈপালে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য শস্যের উৎপাদন অনেক কম। পাশ্ববর্তী জেলা থেকে এখানে চাউল আনতে হয়। হঠাৎ করে পরিবহন ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যায়। এর জন্য গ্রামের গরীব জনসাধারণকে মাঝে মাঝে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। কোন কারণে তামাক থেকে পরিমিত অর্থ লাভ না হলে তামাক চাষীদের অনাহারে দিন কাটাতে হয়।

১৩। সুপারিশ

কৈপাল গ্রামের তামাক চাষীদের সমস্যা খুবই প্রকট। এটা একই সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে সব আন্দোলনের পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। তামাক চাষীদের এই অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তি সুস্থ সামাজিক এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য একান্ত কাম্য। তামাকের শোষণমূলক বিপণন ব্যবস্থা রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) বিটিসির একচেটিয়া ব্যবসা

প্রথমেই বিটিসির একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য অন্যান্য তামাক কোম্পানীগুলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া যেতে পারে। তখন সে সকল কোম্পানী প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়ে বিটিসির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ব্যবসা করতে পারবে।

(খ) বিটিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ড

শুধুমাত্র তামাক উৎপাদনকারীদেরকে বিটিসির কার্ড ইস্যু করতে হবে। যে সমস্ত তামাক ব্যবসায়ীদের নামে কার্ড আছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের

মাধ্যমে তাদের কার্ড বাতিল করতে হবে। তামাক উন্নয়ন বোর্ড এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

(গ) সমবায় সমিতি

তামাক চাষীদের নিয়ে শক্তিশালী সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে। সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারে এবং সার ক্রয় ও তামাক শোধনের সময় চাষীদের ঋণ দিতে পারে।

(ঘ) ব্যাংক ঋণ

গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংক ঋণ চাষীদের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ধনী চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে গরীব চাষীরাও যাতে ঋণ পান সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) তামান উন্নয়ন বোর্ড

তামাক উন্নয়ন বোর্ডকে আরও কর্মক্ষম ও শক্তিশালী করতে হবে। বোর্ডের কর্মচারীদের কৃষকের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য যাতে কৃষকরা পান সেদিকে বোর্ডের স্বক্রিয় নজর রাখতে হবে।

(চ) বিটিসির নিরপেক্ষতা

কোন প্রভাবশালী চাষী কিংবা ব্যবসায়ী যাতে বিটিসি ব্যবস্থাপনাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে সরকারের সর্বদা সক্রিয় নজর রাখা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য।

(ছ) চাহিদা ও সরবরাহ

তামাকের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যেন বেশী না হয় সেদিকে তামাক চাষীদের নজর রাখতে হবে। এর জন্য সংঘবদ্ধ প্রচারের প্রয়োজন।

১৪। উপসংহার

তামাকের বিপণন ব্যবস্থার সমস্যা শুধু কৈপাল গ্রামেরই সমস্যা নয়, এটা একটা জাতীয় সমস্যা। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থে এই সমস্যার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে সুপারিশকৃত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদি সময় থাকতে তামাক চাষীদের এই শোষণ বন্ধ করা না হয় তাহলে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অদূর ভৃষ্যিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

BIBLIOGRAPHY

Akehurst, B.C (1968) Tobacco. Longmans, London.

Chandler, W.U (1986) Banishing tobacco, Paper 68. Worldwatch Institute, Washington DC.

Economist Intelligence Unit, Leaf tobacco-its contribution to the economic and social development of the Third World (1980) Economist Intelligence Unit, London

Harrison, Paul (1970) Inside the Third World. Penguin, Harmondsworth Intrnational Union Against Cancer (1977) Guidelines for smoking control, Geneva.

Muller, Mike (1978) Tobacco and the Third World: tomorrow's epidemic ? War on Want, London.

Ramstrom. Lars M. (ed) (1980) The smoking epidemic. Foruth World Conference on Smoking and Health, Stockholm (1980).

Shepherd E (1975) Prospects for unmanufactured tobacco to 1984. Economist Intelligence Unit, London.

UNCTAD (1978) Marketing and distribution of tobacco. United Nations, Geneva.

WHO (1982) Smoking control strategies in developing countries: Report of the WHO Committee, Technical Report Series NO. 695, Geneva

Wickstrom, Ho (1979) Cigarette marketing in the Third World. Gothenburg University.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা

মাইনউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী*

১। ভূমিকা

অর্থনীতির বিশ্বায়নে তৃতীয় বিশ্বের অত্যন্ত দরিদ্র ও গরীবতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বদেশী পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ সকল ক্ষেত্রে একটা অসম প্রতিযোগিতার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতায় অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকা সত্বেও একথা বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের সম্ভাবনা এক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী। ভাবতেও অবাক লাগে যে তাঁতী ও তাঁত শিল্পের জাতীয় অর্থনীতিতে অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্বেও তাঁত শিল্পের জন্য যে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা চালানো দরকার তা আজও হয়নি। এ প্রেক্ষিতেই প্রবন্ধটির মূল বিষয় হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা উদঘাটন করা।

১.১ ঢাকাই মসলিন গ্রন্থের লেখক ডঃ আব্দুল করিমের মতে, বাংলাদেশের সূতী বস্তের ইতিহাস অনেক পুরনো। স্মরনাতীতকাল থেকে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বঙ্গে বা পূর্ব বঙ্গে সুক্ষ্ণ সূতী বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, রোমান আমলে এবং পেরিপ্ লাস ও টলেমির যুগে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের সুনাম ছিল। এ দেশীয় সূতার কাপড় তখন রোম সাম্রাজ্যে এবং মিশর প্রমূখ দেশে রপ্তানী করা হত। চতুর্দশ শতকে তীরভূক্তি বা তিরস্থতবাসী কবি শেখ রাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানা প্রকার পটাম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ উদম্বরে, গংগা, সাগর, গাংগোর লক্ষী বিলাস, দ্বার বাসিনী এবং 'শিলহটী পটাম্বরের উল্লেখ করেছে। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন এগুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পাটবস্ত্র। নবম শতকের বনিক সুলেমান, ত্রয়োদশ শতকের ভেনিসের পর্যটক মার্কপোলো, পঞ্চদশ শতকের চীন পরিব্রাজক মা হুয়ান, চতুর্দশ শতকের আরবীয় পর্যটক ইবনে বতুতা সকলেই বাংলাদেশের সুক্ষ্ণ বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে ইবনে বতুতা সোনার গাঁও এর তৈরী সূতী বস্ত্রের প্রশংসা করেন। ষোড়শ শতকের ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলও সোনার গাঁও - এ তৈরী মসলিনের বিশেষ প্রশংসা করেন।

---

*যুগ্মসচিব, বর্তমানে পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

১.২ তাঁতের সোনালী যুগ, চিরস্থায়ী হয়নি। ১৭৫৭ সালে জগৎ শেঠ গংদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় বেনিয়া ইংরেজের ১৯০ বছরের অন্ধকার রাজত্বের। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব দেশী তাঁতীদের সর্বনাশ ডেকে আনে। কলে প্রস্তুত মোটা কাপড়ের বাজার তৈরীর জন্য বেনিয়া রাজশক্তি সকল ধরণের অপচেষ্টার আশ্রয় নেয়। কথিত আছে মসলিন প্রস্তুতকারক তাঁতীদের হাতের আঙ্গুল কেটে দেয় সেদিনের দখলদার শ্বেত শাসক। শত শত বছরের অব্যাহত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাঁতপণ্য শৈল্পিক নিপুণতার শিখরে পৌঁছায়। অথচ উপনিবেশিক প্রায় দু-শতাব্দী নিদারুণ নিপীড়ন সে শিল্পকে অতলান্ত অন্ধকারে ঠেলে দেয়। বাংলার তাঁতীরা রিক্ত হয়ে যায়, তাঁত পণ্যের অতুলনীয় উৎকর্ষতা অতীতের প্রবাদ গাঁথায় পরিণত হয়।

১.৩ উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্গল ভাঙ্গার গান নতুন প্রাণের ছন্দ যোগায়। তাঁত বস্ত্র স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠে। কন্ঠে কন্ঠে গান অনুরণিত হয়, "মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই ....।" দক্ষিণ এশিয়ায় সর্ব প্রথম চরখার মাধ্যমে খদ্দরের সূতা এবং হস্তচালিত তাঁতে খদ্দর কাপড় প্রস্তুত শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের ফেণী জেলাসহ ঐ সময়েই বাবুরহাট, টাঙ্গাইল, শাহাজাদপুরে তাঁত পণ্যের খ্যাতনামা গঞ্জ গড়ে ওঠে।

১.৪ উপনিবেশিক শাসনাবসানের মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশের মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে। পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটো দেশের উদ্ভব ঘটে। রাজনৈতিক এই পরিবর্তন তাঁতীদের জীবনে অস্থিরতা ডেকে আনে। বিশেষ করে হিন্দু মহাজনদের ভারত গমনের ফলে তাঁত শিল্পে পুজিহীনতা দেখা দেয়। তাছাড়া সূতাকলের বেশির ভাগ ভারতের ভাগে পড়ায় পণ্যের কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি বিচার করে তৎকালীন সরকার ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের মাধ্যমে সূতা আমদানী শুরু করে। তাঁত বস্ত্রের বিক্রয় কর মওকুফ হয়। তাঁত শিল্পে সুবাতাস বইতে থাকে। সব মিলিয়ে বলা চলে ১৯৪৭-৫২ সাল পর্যন্ত এদেশের তাঁতের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে থাকে।

১.৫ ১৯৫২ সালের পর থেকে সুতার উচ্চমূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তাঁত শিল্পে আবার অস্থিরতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মূল্য ও বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রন চালু হয়। তাঁত শিল্পের ক্রমাগত সমস্যার কথা বিবেচনা করে ৫৪ সালে তথ্য অনুসন্ধান কমিটি বসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত সূতার বাজার হিসেবেও এ দেশের তাঁত শিল্পকে গড়ে তোলার কোনো জোরালো প্রয়াস নেয়নি তৎকালীন সরকার।

১.৬ ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ফলে পাকিস্তানের সাথে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাণিজ্যি সম্পর্কের ইতি ঘটে। পরিণামে দেশে সূতার অভাব তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৯ সালের পূর্ববতী দিনগুলোর মতই সঙ্গীন হয়ে ওঠে সূতার বাজার। তখন টিসিবি'র মাধ্যমে সূতা আমদানী, দেশীয় সূতাকলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৎপর হয়ে ওঠে বাংলাদেশ সরকার।

২। তাঁত শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি পুরাতন। সতের শতাব্দী হতেই এদেশে তৈরী বস্ত্র সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে। ঢাকার তৈরী মসলিন রাজা, রানী ও বাদশাহের কাছে ছিল এক গর্বের বস্তু, কেননা বিশ্বের আর কোথায়ও এ ধরনের বস্ত্র আজও তৈরী হয়নি। এক সময়ে এদেশে তৈরী মসলিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে বাংলাদেশ একদিকে যেমন বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, অপরদিকে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন তৈরীর জন্য ইতিহাসে এক বিরল গৌরবময় স্থান লাভ করেছিল। সময়ের আবর্তে এ দেশের তাঁত শিল্পের সেই শৈল্পিক মান, নিপুনতা, ঐতিহ্য, গৌরব ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। অধিকন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে তাঁত শিল্পে চলেছে এক মারাত্মক সংকট। উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ, মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মেটানো, উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণন সকল ক্ষেত্রে এদেশের তাঁতীরা ক্রমান্বয়ে মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণীর মহাজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তারা উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মহাজনদের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাঁত শিল্প ক্রমশঃ অলাভজনক শিল্পে পরিনত হতে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী কমপক্ষে ৫০ - ৬০ টাকা, অথচ একজন তাঁতী সারাদিন কাজ করে আয় করে ৩০ - ৩৫ টাকা। ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক তাঁতী পৈত্রিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করছে। আবার কখনও বা বেকার জীবন যাপন করছে।

২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হস্তচালিত তাঁত শিল্প বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের শতকরা ৬৩ ভাগ হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন হয়। ১৯৯০ সালের তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান তাঁত সংখ্যা ৫,০১,৮৩৪টি। তম্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩,১৭,০২৬টি এবং অচল তাঁতের সংখ্যা ১,৮৪,৮০৮টি। এই শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও অধিক। তাই বস্ত্র উৎপাদন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি

৩.১ তাঁত ও বস্ত্র সম্পর্কে তথ্য

দেশে মোট বস্ত্রের চাহিদা	ঃ ১৩২ কোটি মিটার
হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণ	ঃ ৬৯ কোটি মিটার
দেশের মোট তাঁত ইউনিটের সংখ্যা	ঃ ২,১২,৪২১
দেশে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা	ঃ ৫,০১,৮৩৪
মোট চালু তাঁতের সংখ্যা	ঃ ৩,১৭,০২৬
মোট অচল তাঁতের সংখ্যা	ঃ ১,৮৪,৮০৮
মোট তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ১০,২৭,৪০৭

৩.২ প্রকারভেদে মোট তাঁতের সংখ্যা

পিট তাঁত	ঃ ৩,১০,৫০৫
আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁত	ঃ ১,৯১,৩২৯
কোমর তাঁত	ঃ ৬৫,১২৪
প্রতি ইউনিটে গড়ে তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ৪.৪৩ জন
প্রতি তাঁতে গড়ে তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ২.৯২ জন
পিট তাঁতে গড়ে দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ	ঃ প্লেনঃ ৬.৫-১১ মিটার ডিজাইনঃ ৪.৫-৯ মিটার

৩.৩ অন্যান্য তথ্যাদি

দেশের হস্তচালিত তাঁতে সুতার মোট - মাসিক চাহিদা	ঃ ২.৭৬ কোটি পাউন্ড
প্রতি তাঁতে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ	ঃ ১০,০০৮.০০ টাকা
প্রতিটি তাঁতের ঋণের চাহিদার পরিমাণ	ঃ ৮,৯০৪.০০ টাকা (১৯৯১ এর মূল্যে)
হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র উৎপাদনের মূল্য	ঃ ২৩২৮ কোটি টাকা
হস্তচালিত তাঁতে বার্ষিক মোট মূল্য সংযোজন	ঃ ১০০০.০০ কোটি টাকা
তাঁত বোর্ডের আওতায় প্রাথমিক তাঁতী - সমিতির সংখ্যা	ঃ ১০৮৬টি
মাধ্যমিক তাঁতীর সংখ্যা	ঃ ৫৪টি
জাতীয় তাঁতী সমিতির সংখ্যা	ঃ ০১টি।

৪। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষির পরেই এ শিল্পের স্থান। হস্তচালিত তাঁত শিল্প বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। দেশে উৎপাদিত মোট বস্ত্রের শতকরা ৬৩ ভাগ হস্তচালিত তাঁতেই উৎপাদিত হয়। এ শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ১০.০০ লক্ষের অধিক যার অর্ধেক প্রায় মহিলা। সুতরাং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক থেকে বিচার করলে তাঁত শিল্পের কোন বিকল্প নেই। তথাপিও এ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। অথচ এ দেশের তাঁতের তৈরী মসলিন এক সময় বিশ্ব বাজারে সুপরিচিত ছিল। এজন্য এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা।

৪.১ তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সে সম্পর্কে প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত Total Quality Management (TQM) পদ্ধতি পর্যালোচনা করে এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কিভাবে তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যা দূর করা সম্ভব সে ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

৫। পদ্ধতি

এ প্রবন্ধ প্রণয়নে মূলতঃ মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন ও গবেষণা পরিষদ প্রভৃতি সংস্থায় এ শিল্পের উপর প্রাপ্য তথ্যাদি ও বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এ প্রবন্ধে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁত বোর্ডের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেয় তথ্যাদিও এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৬। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ব্যবস্থাপনা সমস্যার বিবরণঃ

গোড়া থেকেই বাংলাদেশের তাঁত শিল্প এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে আসছে। দিনে দিনে এ প্রতিযোগিতা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনিতেই তাঁত শিল্প তথা তাঁতীরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার উপরে সারা বিশ্বে এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির অবিরাম ধারার সাথে বাংলাদেশের তাঁত শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। এ প্রেক্ষাপটে তাঁত শিল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিম্নরুপঃ

- সাংগঠনিক দূর্বলতা,
- উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ,

- চলতি মূলধনের অভাব,
- উন্নত মানের রং, রসায়ন ও তাঁত সরঞ্জামাদির অভাব,
- প্রযুক্তি ও দক্ষতাজনিত সমস্যা,
- উন্নত নকশার অভাব,
- তাঁত বস্ত্রের বিপণনের সমস্যা।

৬.১ সাংগঠনিক দূর্বলতাঃ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতীরা সংগঠিত নয়। ফলে সাধারণ লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে তারা অপারগ। তাই তারা তাঁতী সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হবার চেষ্টা করছে। অন্যথায় তাঁদের সমস্যা সমাধানের কোন পথ নেই।

৬.২ উৎপাদন উপকরণ সরবরাহঃ তাঁতীরা সাধারণতঃ ন্যায্যমূল্যে উন্নত মানের প্রয়োজনীয় কাউন্টের নিয়মিত সূতা সরবরাহ পায় না। ফলে তাদের উৎপাদন কার্যক্রম ব্যহত হয়। তাঁত বোর্ড সূতা উৎপাদন করে না। বিটিএমসি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলগুলো সূতা উৎপাদন করে। আবার তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতেই বিটিএমসি কর্তৃক তাদের মিলে উৎপাদিত সূতা প্রতিষ্ঠানিক ক্রেতাদের মধ্যে বরাদ্দ করা হয়, তবে তা পরিমাণে যেমন অপ্রতুল, তেমনি তা প্রয়োজনীয় কাউন্টের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। উপরন্ত দূরবর্তী মিল থেকে সুতা বরাদ্দ দেয়া হয়, ফলে পরিবহনজনিত কারণে তা অনেক সময় উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া উক্ত কাউন্টের সূতা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। যার মূল্য তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় বস্ত্রের উৎপাদন খরচ বেশী হয়। ফলে প্রতিযোগিতামূলক দরে দেশীয় বস্ত্র টিকে থাকতে পারছে না।

৬.৩ চলতি মূলধনের অভাবঃ দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০১,৮৩০টির মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩,১৭,০২৬টি এবং অচল/বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ১,৮৪,৮০৮টি। তাঁত শুমারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি মূলধনের অভাবে বন্ধ তাঁতের ৯৭.২% তাঁত বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া সূতার অভাব, শ্রমিক সমস্যা এবং বিপণন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণেও অনেক তাঁত বন্ধ রয়েছে। সারণী - ৩ এ তাঁত বন্ধ হওয়ার কারণসমূহ দেখানো হলোঃ

সারণী - ১

তাঁত বন্ধ থাকার কারণ	তাঁতের ইউনিট সংখ্যা	শতকরা হার
ক. চলতি মূলধনের অভাব	১,২৩,৫৯৭টি	৯৭.২
খ. সূতার অভাব	১২,২৮৪টি	০৯.৭
গ. শ্রমিকের সমস্যা	২,৩৩৪টি	০১.৮
ঘ. বিপণনের সমস্যা	৫,৮৬০টি	০৪.৬
ঙ. অন্যান্য	১০,২২০টি	০৮.০

উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁত বন্ধ থাকার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে চলতি মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে তাঁতীকে মহাজনের নিকট থেকে বাকীতে রং, রসায়ন ও সূতা ক্রয় করতে হয়। বাকীতে ক্রয়ের জন্য মহাজনকে বাকীতে ক্রীত সূতার প্রকৃত মূল্য পরিশোধ ছাড়াও, তাঁতীকে অত্যন্ত চড়া হারে সুদ প্রদান করতে হয়।

৬.৩.১ উইভার্স ক্রেডিট স্কীমের আওতায় ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশের মোট ১,০৩,২১৮ জন তাঁতীকে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৯৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। ঐ ঋণ সুবিধা তাঁতীরা পায়নি। এ ঋণ তাঁতী নামধারী টাউট বাটপাড়দের হাতেই বেশী পড়ার ফলে ঋণ আদায় সন্তোষজনক হয়নি ঋণ আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় পুনরায় ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহ উৎসাহ দেখাচ্ছে না ফলে তাঁতীদের মূলধনের অভাব আরোও প্রকট হয়েছে। অন্যদিকে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য সরকারের দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলার জন্য ঋণ গ্রহীতা বহু তাঁতী হয়রানীর শিকার হচ্ছে।

৬.৩.২ অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে অতি অল্প পুঁজিতে ছোট ও মাঝারী আকারের তাঁত প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে বস্ত্র উৎপাদন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থাপনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা, প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান করা এবং উৎপাদিত বস্ত্রের যথোপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের তাঁত প্রকল্প স্থাপনের জন্য যথেষ্ট তহবিল বরাদ্দ না থাকায় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে এ ধরণের প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান করা যাচ্ছে না। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের তাঁত প্রকল্প স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠনপূর্বক তা দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে।

৬.৪ উন্নতমানের রং, রাসায়নিক ও তাঁত সরঞ্জামাদির অভাব

তাঁত শিল্পে বাৎসরিক প্রায় ১৫৫ কোটি টাকার রং ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যার অধিকাংশই আমদানীকৃত। দেশীয় রং এর নিম্নমান এবং আমদানীকৃত রং এর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণেও তাঁতীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। রং, রসায়নিকের উচ্চ মূল্য ছাড়াও অতি মুনাফা লাভের জন্য ব্যবসায়ীরা রং এবং রাসায়নিকে বিভিন্ন রকম ভেজাল মেশায়। ফলে সঙ্গত কারণে রঙ্গিন তাঁত বস্ত্রের মান নিম্ন হয় এবং বাজারে তাঁত বস্ত্রের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। এ কারনে তাঁতীরা এ ধরণের বস্ত্র উপযুক্ত দামে বাজারে বিক্রয় করতে সক্ষম হয় না। উপযুক্ত মুনাফা লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁত বস্ত্রের বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে বিভিন্ন বস্তুগত উপাদানের দাম পরিশোধের পর তাঁতীদের হাতে মুলধন গঠনের জন্য কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁতীকে হয়

তার তাঁত বন্ধ রাখতে হয় নতুবা নিজ তাঁত বিক্রয় করে নিঃস্ব হতে হয়। বাজারে তাঁত বস্ত্রের সুনাম বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উন্নতমানের সূতা সরবরাহের পাশাপাশি উপযুক্ত দামে তাঁত বস্ত্রে ব্যবহারোপযোগী উন্নতমানের রং ও রসায়ন দেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এতে রঙ, রসায়নের ক্ষেত্রে দেশের আমদানী নির্ভরশীলতাও কমবে এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে। এছাড়া তাঁতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের অধিকাংশই আমদানী করা হয়। অত্যন্ত চড়াদামে তাঁতীকে এই সমস্ত সরঞ্জামাদি বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির পিছনে তাঁত সরঞ্জামের উচ্চ মূল্যের প্রভাবও অপরিসীম। উৎসাহী উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁত সরঞ্জামাদির উৎপাদনের জন্য সারাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের তাঁত সরঞ্জামাদি তৈরীর কারখানা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান একান্ত আবশ্যক।

৬.৫ প্রযুক্তি ও দক্ষতাজনিত সমস্যা

দেশে চালু তিন লক্ষ সতের হাজার তাঁতের মধ্যে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পিট তাঁত। এ তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় অর্ধেক। ফলে এ তাঁত চালিয়ে একজন তাঁতী যা আয় করে তা নিতান্তই যৎসামান্য (জামদানী ও বেনারসী তাঁত ব্যতীত)। এ স্বল্প পরিমাণ আয় দিয়ে অনেকে সংসার যাত্রা নির্বাহে ব্যর্থ হয়ে এ পেশা ছেড়ে দিয়েছে। পাশাপাশি বহু তাঁতী দক্ষতার অভাবে উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করতে পারছে না।

অপরদিকে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন তাঁত বহুল এলাকায় হস্তচালিত তাঁতে বড় আকারের বিছানার চাদর তৈরী করা হয়। দেশী বাজারে ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই বড় বিছানার চাদরের যথেষ্ঠ চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বড় আকারের বিছানার চাদর তৈরীর জন্য তাঁতের রীড স্পেস ৯০" হওয়া আবশ্যক। এই মাপের তাঁতের যোগান ও উৎপাদন অতি সীমিত এবং এ ধরণের তাঁত সরঞ্জামের দাম অত্যধিক হওয়ার কারণে দরিদ্র তাঁতীদের পক্ষে এই তাঁত সংগ্রহ করা প্রায়শই সম্ভব হয় না। অথচ এ ধরণের তাঁতের উৎপাদিত বস্ত্রের ভাল বাজার চাহিদা থাকায় তাঁতীর পক্ষে বড় আকারের বিছানার চাদর উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অধিক উপার্জন করা সম্ভব। তাঁতীর আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় এদিকটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

৬.৬ উন্নত নকসার অভাব

বাংলাদেশের বস্ত্রের নকসা ও বয়ন উৎকর্ষ উন্নত নয়। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ক্রেতাদের খুব কমই আকৃষ্ট করতে পারে। উন্নত নকসা এবং উজ্জ্বল রং এর কারণে বাংলাদেশী মহিলারা ভারতীয় শাড়ী ক্রয়ে অধিক আগ্রহ দেখান। পুরাতন, সনাতন

নকসা যুগ যুগ ধরে পরিবর্তনশীল। চাহিদার কারণে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত নকসা উদ্ভাবন ও তা বস্ত্র শিল্পে প্রয়োগ করে ভোক্তার চাহিদা মেটাতে হবে। শুধু তাই নয় উন্নত নকসার সাথে প্রয়োজন সুষ্ঠু রং মিশ্রণ (Colour Matching), উজ্জ্বল রং ব্যবহার এবং কাপড়ের নমনীয়তা (Pliability) নিশ্চিত করা। কিন্তু উন্নত নকসা, দক্ষ নকসাকারক, উন্নতমানের রং এবং ফিনিশিং সুবিধার অভাবে উপরোক্ত চাহিদার কোনটিই মেটানো সম্ভপর হচ্ছে না।

৬.৭ তাঁত বস্ত্রের বিপণনের সমস্যা

৬.৭.১ উচ্চ মূল্য

তাঁত বস্ত্রের উপকরণের উচ্চ মূল্য, উন্নতমানের সূতা ও বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণের সুযোগের অভাব, আমদানীকৃত উপকরণের উপর উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় কর ধার্যের কারণে তাঁত উৎপাদন ব্যয় ছ-মাস অন্তর শতকরা প্রায় ১০ - ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাজারে তাঁত বস্ত্রের দাম প্রায় স্থবির এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁত বস্ত্রের দামের নিম্নগতির ফলে তাঁতীরা লাভজনক দামে পণ্য বিক্রয় করতে পারছে না।

৬.৭.২ ভারতীয় সূতা ও বস্ত্রের অবৈধ অনুপ্রবেশ

দেশে সূতার অভাব থাকার কারণে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে সূতা চোরাই পথে অনুপ্রবেশ করে। এতে বয়ন শিল্পে কিছুটা আপততঃ সুবিধা হলেও সুতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশের বস্ত্র শিল্পের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। ভারতীয় কাপড় তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা। আকর্ষণীয় ও উন্নত নকসার কারণে দেশে এর প্রচুর চাহিদাও রয়েছে।

৬.৭.৩ পোষাক মালিক কর্তৃক শুল্ক মুক্ত প্রয়োজনীয় কাপড়ের অতিরিক্ত কাপড় আমদানী

দেশের রপ্তানীমুখী শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কোটি মিটার কাপড় ব্যবহার করা হয়। এর সম্পূর্ণটাই প্রায় বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। বন্ডেড ওয়ার হাউজ সিস্টেমের অধীনে শুল্কমুক্তভাবে উক্ত কাপড় বিদেশ থেকে আমদানী করা হয় এবং আমদানী ব্যয় মিটানো হয়। ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট এর মাধ্যমে এই নমনীয় আমদানী নীতির অধীনে পোষাক শিল্পের জন্য আমদানীকৃত বস্ত্রের একটি অংশ বিভিন্ন কায়দায় স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করে। পোষাক শিল্প ইউনিটগুলির রপ্তানীযোগ্য পোষাক তৈরীর জন্য আমদানীকৃত কাপড়ের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করার কোন নিঃচ্ছিদ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে পোষাক শিল্পের জন্য আমদানীকৃত কাপড়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করে। রপ্তানীযোগ্য পোষাক তৈরীর উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত কাপড়ের

সঠিক ব্যবহারের রেকর্ড রাখার জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৮৫ সনে পাশ বই সিস্টেম চালু করার পরেও পোষাক শিল্প থেকে অননুমোদিতভাবে বের হয়ে যায় শুল্ক মুক্ত বিদেশী কাপড়। ফলে দেশী তাঁত বস্ত্র এক অসম প্রতিযোগীতা সম্মুখীন হচ্ছে। এই অসম প্রতিযোগিতার ফলে তাঁত বস্ত্রসহ দেশী সকল প্রকার কাপড়ের বিপণন দিন দিন অলাভজনক পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে।

৬.৭.৪ মন্দা মৌসুম

সাধারণতঃ তাঁতীদের জন্য বর্ষাকালটি মন্দা মৌসুম। তিন থেকে চার মাস ব্যাপী এই মন্দা মৌসুমে তাঁতীদের উৎপাদিত কাপড়ের বাজার চাহিদা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। এ সময়টাই তাঁতীদের জন্য মারাত্মক দূর্যোগকালীন সময়। এই মন্দা মৌসুমে তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাঁতীর কাপড় ন্যায্য দামে কিনতে আগ্রহী হয় না। ফলে কোন প্রকার মুনাফা ছাড়াই অতি সস্তা দামে তাঁতীকে কাপড় বাজারজাত করতে হয়। মূলধন হিসাবে তাঁতীর হাতে কোন প্রকার উদ্বৃত্ত না থাকার কারণে ঐ সময়ে পরবর্তী উৎপাদন কর্মকান্ডের জন্য তাঁতীকে হয় উচ্চমূল্যে বাকীতে মহাজনের নিকট থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় এবং সস্তায় মহাজনের কাছে উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় করতে হয়, নতুবা উচ্চ সুদের হারে মহাজনের নিকট থেকে মূলধন যোগানের জন্য অর্থ ধার করতে হয়। মোট কথা এই মন্দা সময়ের মধ্যে যে তাঁতী একবার দারিদ্রের ঘূর্ণায়মান আবর্তে (Vicious Circle of poverty) নিপতিত হয়, সে সহজে আর সে আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাঁতীর অস্তিত্বের প্রশ্নটি তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় এ সময়ের তাঁতীদের উৎপাদিত কাপড়ের মূল্যের বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁতীর উৎপাদিত কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রক্ষা সম্ভব। কিন্তু কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণতঃ এ ধরণের ঋণ প্রদানে আগ্রহী না হওয়ার কারণে তাঁত শিল্পের সেবায় একটি বিশেষায়িত তাঁতী ব্যাংক স্থাপন করে বিশেষ তদারকী ব্যবস্থায় এ ধরণের ঋণদান কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

৬.৭.৫ মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ

তাঁতীদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও সংগঠন না থাকায় তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র মূলত ফড়িয়া ও মহাজনদের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ করা হয়। এতে তাঁতীরা উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য পায় না। সুবিধা লুটে নেয় মধ্যস্বত্বভোগী ফঁড়িয়া ও অভিজাত ধনী ব্যবসায়ীরা।

৭। তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সরকারী কার্যক্রম

জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন এবং তাঁতীদের কল্যাণে বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সরকার এক অধ্যাদেশ বলে তাঁত বোর্ড গঠন করেন।

৭.১. তাঁত বোর্ডের বর্তমান কার্যক্রম

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড তাঁতীদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলোঃ

৭.১.১ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস (এসএফসি) প্রকল্প

প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল, কুমারখালী, বেলকুচি ও বানছারামপুরে একটি করে ৪টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজি সেন্টারস (এসএফসি), চট্টগ্রামস্থ চন্দনাইশে ১টি ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইউনিটসহ দেশের তাঁত নিবিড় এলাকায় ২০টি বেসিক সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁতীদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদানই কেন্দ্রগুলি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য।

৭.১.২ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প

তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উন্নত বয়ন প্রণালীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সরঞ্জমাদি আধুনিকরণের কলাকৌশলের উপর গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে নরসিংদীতে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র ও সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। উন্নত বয়ন প্রণালীর উপর কেন্দ্রটি থেকে ২ মাস মেয়াদী ৮টি কোর্সের মাধ্যমে বৎসরে মোট ১৬০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

তাঁতীদের প্রশিক্ষণ চাহিদার তুলনায় বিদ্যমান স্থাপিত প্রশিক্ষণ সুবিধার অপ্রতুলতা এবং শিল্পের অভাবিত উন্নতির প্রেক্ষাপটে দেশের তাঁত বস্ত্রের মান বৃদ্ধি, উৎকর্ষ সাধন, নকশা উন্নয়ন, ছাপা ও ফিনিশিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁতীদেরকে অধিক হারে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৩.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি) শীর্ষক আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পাবনার বেড়াতে একটি প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্র দুটি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ২০৪৪ জন তাঁতীকে নিম্নে বর্ণিত কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.১.৩ বেনারসী পল্লী প্রকল্প

অস্বাস্থ্যকর ও ঘিঞ্জি এলাকায়, রাস্তার উপর সরকারী জায়গায় বসবাসরত ও বেনারসী শিল্পে নিয়োজিত তাঁতীদের আবাস-কাম-কারখানার জন্য প্লট বরাদ্দ,

উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা দান, চলতি মূলধনের আয়োজন, বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা ও সুবিধাদি প্রদানে সহায়তার জন্য একটি বেনারসী পল্লী প্রতিষ্ঠা করা প্রকল্পটি মূল উদ্দেশ্য।

এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০ একর জমির উপর প্রতিটি ৩ শতাংশ করে ৯০৬টি প্লট তৈরী করে ৯০৬ জন বেনারসী তাঁতীকে ২০ বছরের সময়সীমার মধ্যে কিস্তিতে জমির মূল্য পরিশোধের সুযোগ রেখে প্লট বরাদ্দ করা হবে। প্রকল্প এলাকায় রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, গ্যাস বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, স্কুল, মসজিদ ও খেলার মাঠ প্রভৃতি নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭.১.৪ জামদানী শিল্প প্রকল্প

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দুরে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানায় শীতলক্ষার তীরে ১২টি গ্রামে জামদানী শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্ণবৈচিত্র আর নক্‌শার কারুকার্যে অপরূপ একটি জামদানী শাড়ী বুনতে দরকার হয় প্রায় ২০০ গ্রাম কার্পাস অথবা রেশমী সূতা আর সোনালী অথবা রূপালী জরি। জামদানী শিল্পের তথ্যাবলী তথ্যাবলী নিচে দেয়া হলোঃ

ক)	জামদানী তাঁতী পরিবারের সংখ্যা	ঃ ৩১১৫টি
খ)	জামদানী তাঁত শিল্প এলাকায় - গ্রামবাসীর সংখ্যা	ঃ ৭০,০০টি
গ)	জামদানী তাঁতের সংখ্যা	ঃ ৫৭০০টি
ঘ)	বার্ষিক মোট জামদানী শাড়ী - উৎপাদনের পরিমাণ	ঃ ১,৫৭,৬৪৪টি (প্রতিটি শাড়ী ৬ মিটার)

৭.১.৫ তাঁত বস্ত্রের বাজারজাতকরণ প্রকল্প

দেশীয় তাঁত বস্ত্র বিপণনের জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র ছোট গ্রাম্য হাট বাজারে বিক্রী হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী তার উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্যমূল্য পায় না। উৎপাদনকারী তাঁতীর বস্ত্র মহাজন/ফড়িয়ারা ক্রয় করে থাকে। তাঁরা ক্রীত বস্ত্রাদি অধিক মূল্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রী করে থাকে। এতে দেখা যায় উৎপাদনকারী তাঁতীর কাছ থেকে ভোক্তার হাত পর্যন্ত কাপড় পৌছাতে ৪০% - ৪৫% বেশী দাম দিতে হয়। অথচ দরিদ্র তাঁতী তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে একটি সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন

আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁত বস্ত্র বাজারজাতকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ঢাকায় একটা স্থায়ী বস্ত্র এমপোরিয়াম ও দুটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে মোট ৭টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া দেশের বিখ্যাত তাঁত বস্ত্র বিপণনের হাটে তাঁতীদের বস্ত্র সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের সুবিধার্থে ৭টি তাঁত শেড নির্মাণ করা হবে। তাঁত বস্ত্রের বিপণন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও দেশী - বিদেশী মেলায় অংশগ্রহণও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭.১.৬ তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী প্রকল্প

বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ১৯৯০ সালে সম্পাদিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০১,৮৩৪টি। তম্মধ্যে দেশে বিদ্যমান হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৩,১৭,৮২৬টি এবং চালু নেই এমন তাঁতের সংখ্যা ১,৮৪,৮০৮টি। এত বিপুল সংখ্যক তাঁত বন্ধ থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্র তাঁতীদের মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে তাঁতীদের তাঁত বন্ধ থাকায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দারিদ্রক্লিষ্ট প্রান্তিক তাঁতীরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ পরিস্থিতির আশু অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাঁতীদের তদারকীমূলক ঋণ প্রদান করে বিদ্যমান তাঁতসমূহ চালুকরণ, বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। তাঁত খাতের উদ্দেশ্য/লক্ষ্য

দেশের শিল্পোন্নয়নের সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে বস্ত্র শিল্পকে অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রতি দেশেই বস্ত্র শিল্প শিল্পোন্নয়নের ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্প্রতি থাইল্যান্ড বস্ত্র শিল্পকে সে দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বারোপের মাধ্যমে দেশের শিল্পান্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপখাত হচ্ছে তাঁত। বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপখাত হিসেবে তাঁত শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের বস্ত্র/তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নে বর্ণিত সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য/লক্ষ্য নির্ধারণ করা আবশ্যকঃ

দেশে বিদ্যমান স্পিনিং, হস্তচালিত তাঁত, পাওয়ারলুম, ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি উপখাতগুলোর স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচন।

৮.১ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কৌশলসমূহ

ক) তাঁতী গ্রুপ গঠন ও সেগুলির স্বীকৃতিদান এবং তাঁদের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উপর ন্যাস্তকরণ;

খ) বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, চলতি মূলধনের অভাবে তাঁতীদের বেশিরভাগ তাঁত চালু নেই। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাঁতীদের সংগঠিত করে তাঁতসমূহ চালু রেখে স্বকর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য তাদের ঋণ প্রদান করা আবশ্যক। এ ঋণ রিভলবিং ফান্ড হিসেবে প্রদান করা;

গ) অধিকতর উৎপাদনশীল তাঁত বিতরণ, সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস স্থাপন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ব্যাপৃতকরণ, তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিতকরণ, উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি সমন্বিত কমসূচীর মাধ্যমে তাঁত খাতের উৎপাদন অনুন্য ২৫% করা;

ঘ) তাঁত খাতের সম্পসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী গ্রহণ।

৮.২ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাঁত বোর্ডের কার্যক্রম

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক হস্তচালিত তাঁত উপখাতে ১৭৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ৮৬.২৫ কোটি মিটারে উন্নীত করা যাবে বলে আশা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এ পরিকল্পনার আওতায় ১৫,০০০ এর অধিক উৎপাদনশীল সেমি-অটোমেটিক তাঁত বিতরণ করা হবে। ফলে প্রায় ৪৫,০০০ নতুন কর্মবর্ষ সৃষ্টি হবে এবং ৫.২৫ কোটি মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হবে। এছাড়া ৫০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ১২ কোটি মিটার অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন ও ১.২০ লক্ষ তাঁতীর সাংবাৎসরিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ১,৬,০০০টি নতুন কর্মবর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছে।

৯। Total Qulity Management (TQM) পদ্ধতি

টি.কিউ.এম পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এটি এমন একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশ তাদের অনুন্নত শিল্প খাতের আশানুরুপ উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। টি.কিউ.এম পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তার কিছুটা বিবরণ দেয়া সমীচীন বলে আমি মনে করি।

"TQM is a management approach for an organisation which is:

- centered on quality;
- based on participation of all of its employees (empowerment);
- aimed at long term effectiveness through customer satisfaction and
- commitment to the developemnt of its employees and to society

৯.১ এ প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের তাঁত শিল্প এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। যার ফলে এ শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পের অবদান ও গ্রামীন কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে পরিগণিত বলেই এর সামগ্রিক উন্নয়নে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (BHB) গঠন করা হয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বোর্ড কাঙ্খিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এ কারণেই আধুনিক টি,কিউ,এম পদ্ধতির আলোকে বোর্ডের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা পরিষদ থেকে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্যোগী করে গড়ে তোলা আবশ্যক। বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বাস্তব ও সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে টি.কিউ.এম পদ্ধতি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

৯.২ বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে যে সকল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে সে সকল কোর্সে তাঁত বস্ত্রের মনোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক। এতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাঁতীরা তাদের পরিচালনাধীন তাঁতে ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী স্বল্প ব্যয়ে মান সম্পন্ন কাপড় উৎপাদনে সক্ষম হলে তাদের উৎপাদিত পন্য প্রতিযোগিতামূলক দরে বাজারে টিকে থাকতে সক্ষম হবে। এতে তাদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। অপরদিকে দেশে আমদানী-বিকল্প বস্ত্র উৎপাদনের ফলে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের সার্ভিস ও বেসিক সেন্টারে কর্মরত কর্মচারীদের টি.কিউ.এম পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গঠিত তাঁতী সমিতির সদস্যরা তাদের উৎপাদন পরিকল্পনার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রাক্কালে উপরোক্ত বিষয়াদির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তাঁত শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁত শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রনয়ন করা হয়েছে।

১০। মতামত ও সুপারিশমালা

তাঁত শিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপট ও সর্বোপরী টি.কিউ.এম পদ্ধতি পর্যালোচনা করে তাঁত শিল্পের বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে এর উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা রাখা হলোঃ

১০.১ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে পুনর্গঠন করা

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্য পরিধি টি.কিউ.এম পদ্ধতির আলোকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করা আবশ্যক। তাঁত বোর্ডের কার্যক্রম তাঁত কারখানা ও তাঁতীদের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ রেখে অত্র বোর্ডকে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, বিভিন্ন শূন্য পদে প্রফেশনাল জনবল নিয়োগ এবং সর্বোপরি বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পর্ষদে তাঁত শিল্পে অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

১০.২ মডেল তাঁতী সমিতি গঠন ও সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় তাঁতীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য তাঁতী সমিতি গঠন করা হয়েছে। এ সব সমিতির আকার এমন হওয়া উচিৎ যাতে সেগুলো অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকতে পারে, আবার এত বড় হওয়া উচিৎ নয় যাতে প্রশাসনিকভাবে সেগুলোকে মাঠ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রনের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে আরও বেশী করে অফিস স্থাপনসহ জনশক্তির সম্প্রসারণ করা আবশ্যক হয়।

১০.৩ পিট তাঁতকে (গর্ত তাঁত) আধুনিক তাঁতে রূপান্তর করা

দেশে বিদ্যমান তাঁতের বেশীর ভাগই পিট তাঁত। এ তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁতের অর্ধেকের কম। বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে পিট তাঁতের পরিবর্তে আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০.৪ উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ

দেশে যে সব সূতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিক্রি হয় তার অধিকাংশ নিম্নমানের এবং দামও তুলনামূলকভাবে বেশী। ফলে দেশীয় বস্ত্রের গুনগতমান ভাল হয় না এবং দামও তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। ফলশ্রুতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বস্ত্র টিকে থাকতে পারছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিয়মিতভাবে গুনগতমান সম্পন্ন সূতা, রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১০.৫ উন্নতমানের রং, রাসায়নিক ও অন্যান্য তাঁত সরঞ্জামাদি সরবরাহ

প্রয়োজনীয় পরিমাণ উন্নতমানের রং ও রসায়নিক দ্রব্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য আমদানী অনুমতিপত্র প্রদানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁতী সমিতির মাধ্যমে উক্ত দ্রব্যাদি আমদানীর ব্যবস্থা নেয়া যায়। প্রয়োজনে বেসিক স্টোরের মাধ্যমে এ সব দ্রব্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা নেয়াসহ অতি মুনাফা ভোগীদের এসব দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া রং, রাসায়নিক এবং তাঁত সরঞ্জামাদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

১০.৬ ডিজাইন সরবরাহ ও প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ

উন্নতমানের ডিজাইন প্রনয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়ঃ

(১) ভোক্তার পছন্দ ও বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে চমৎকার ডিজাইন প্রণয়ন, তাঁত শিল্পে বিদ্যমান মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তি যুগোপযোগীকরণ এবং তাঁতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কম্পিউটার সাহায্যপুষ্ট একটি ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম সেন্টার ফর ডিজাইন, উইভার্স এন্ড রিসার্চ স্থাপন করা যায়।

(২) ভারতীয় উইভার্স সেন্টারের মত প্রস্তাবিত ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম সেন্টারের বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের মত তাঁতীদেরকে উৎপাদন ও তাঁত সংশ্লিষ্ট কারিগরী সেবা প্রদান করতে পারে।

(৩) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টারসমূহ ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডিজাইন সেন্টার ও তাঁতীদের মধ্যে সেতুবন্ধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

(৪) বেসিক সেন্টারকে এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনের জন্য এগুলোকে আগাগোড়া পুনর্গঠন করতে হবে এবং এ সেন্টারগুলিকে কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল দ্বারা পরিচালিত করতে হবে।

১০.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত নরসিংদীস্থ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের মান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ প্রয়োজনঃ

১) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে উৎপাদন পরিকল্পনা, স্বল্প ব্যয়ে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন, বিপণন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করন,

২) তাঁত শিল্পের সকল বিষয়ের উপর পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা পরিচালনা,

৩) প্রতিষ্ঠানটি থেকে অর্জিত গবেষণার ফলাফল বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদন ইউনিটে সফলভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থাকরণ।

১০.৮ চলতি মূলধন সরবরাহ

তাঁত শুমারী'৯০ অনুযায়ী প্রতি তাঁতে চলতি মূলধনের প্রয়োজন গড়ে ৯,০০০.০০ টাকা। বিদ্যমান ব্যবস্থায় তাঁতীরা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে এ অর্থ গ্রহণ করে থাকে। পরবর্তীতে তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র কম মূল্যে ঋণ প্রদানকারী মহাজনদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে তাঁতী তার উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে চলতি মূলধনের অভাবে দেশের প্রায় দুই লক্ষ তাঁত অচল রয়েছে। অচল তাঁতকে চালু করা এবং তাঁতীদেরকে চলতি মূলধন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাঁতীদের ঋণ প্রদানে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ জারী করা আবশ্যক।

১০.৯ সেবা ও সুবিধাদি প্রদান

তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয় বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা ও সুবিধাদি প্রদানের জন্য দেশের তাঁত নিবিড় অঞ্চলসমূহে যে সব হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার ও সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস স্থাপন করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। এ সব সুযোগ সুবিধা ব্যাপক ভিত্তিতে প্রসারের জন্য দেশের বিভিন্ন তাঁত নিবিড় অঞ্চলে আরও বেশী করে সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারস স্থাপন করা প্রয়োজন।

১০.১০ নকসা উন্নয়ন

উৎপাদিত বস্ত্রের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য বস্ত্রের নকসার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি নকসা কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে ছোট ছোট নকসা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সব কেন্দ্রে উদ্ভাবিত নকসা তাঁতীদের মধ্যে সুলভে নিয়মিত বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নকসার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বিষয়ে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ তাঁতীকে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কাপড়ের গুণগতমান উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০.১১ তাঁত বস্ত্রের বাজার ব্যবস্থাপনা

তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে তাঁতীরা তাদের উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য এবং তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যকঃ

(ক) তাঁত বস্ত্রের বিস্তারিত নির্দেশিকাসহ ইন্টারনেট বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী বাজার অন্বেষণের জন্য তাঁত বোর্ড প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহন করতে পারে।

(খ) তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পাদনের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোকে একটি পৃথক শাখা খোলার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। তাঁরা তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী চাহিদার পূর্বাভাস দিবে, রপ্তানী তথ্য সরবরাহ করবে এবং তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়নের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

গ) জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে তাঁত বস্ত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে এবং তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সৃজনশীল ডিজাইন প্রণয়ন, রপ্তানী উন্নয়ন, রপ্তানী ও দেশীয় বাজারে সর্বোচ্চ তাঁত বস্ত্র বিক্রেতাকে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের স্কীম গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, হাসপাতাল, ক্লিনিক, বীমা কোম্পানীকে তাঁত বস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিতে হবে। একই সাথে তাঁত বস্ত্রের রপ্তানী উন্নয়নের লক্ষ্যে তৈরী পোষাক রফতানীকারকদের ন্যায় তাঁত বস্ত্র রপ্তানীকারকদের ফ্ল্যাট রেটে ডিউটি ড্র ব্যাক সুবিধা ও নগদ অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে।

চ) দেশের গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রিতে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে সেখানে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের ব্যবহার বর্ধিত করার বিষয়টি চিন্তা করা প্রয়োজন।

ছ) টেলিভিশনের অনুষ্ঠান উপস্থাপক, ঘোষক, সংবাদ পাঠক, শিল্পী, কলাকুশলীসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাঁত বস্ত্র পরিধান করে অনুষ্ঠানে হাজির হতে অনুরোধ করা যেতে পারে।

জ) প্রতি বছর জুলাই - অক্টোবর এই সময়ে তাঁত বস্ত্র বেচা-কেনার যে মন্দা ভাব দেখা যায় তার কবলে পড়ে বহু তাঁতী নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাঁতীদের এই সংকটকাল উত্তরণে সরকারী উদ্যোগে তাঁতীদের তৈরী তাঁত বস্ত্র ক্রয় করে একটি বাফার স্টক গড়ে তোলা অপরিহার্য।

১১। উপসংহার

সরকারী নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁত শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পঞ্চম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০১ - ২০০২) ১৭৫১২.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সমন্বিত কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তাঁত শিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তাঁতীদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবে এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে অগ্রগতি সাধিত হবে। ফলশ্রুতিতে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

গ্রন্থপুঞ্জি

তাঁত শুমারী, ১৯৭৮।

তাঁত শুমারী, ১৯৯০।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তাব-১৯৯৫।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (১৯৯২), তাঁত শিল্পের সমস্যা ও সমাধান।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প ছকসমূহ।

সাহেদ, হোসনে আরা, (১৯৮০) শাড়ী।

সিরাজ উদ্দিন, মোহাম্মদ, (১৯৭৮) কুটির শিল্প।

Handloom Sector Study (1989), BIDS.

Handloom Economy of Bangladesh in Transition (1989), BIDS.

Ministry of Textile (1997): Report on Handloom Market in India.

Miyan, Dr. Alim Ullah (1981): Handloom Industry of Bangladesh.

Rapport Bangladesh Ltd. (1984), A Non-traditional Handloom Market.

Viability and critical issues of Handloom Sector (1983), MIDAS.

Rapport Bangladesh Ltd. (1984), Weavers Service needs.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

পুস্তক সমালোচনা

বইয়ের নাম ঃ "নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন"

লেখক ঃ মতিউর রহমান গাঙ্গালী

সমালোচক ঃ শ্যামল কুমার সেন*

"যে দেশে সংবাদপত্র স্বাধীন
সে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না" -

এই অমরবাণীটি করেছেন জগৎবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। যিনি শিক্ষা, দর্শন গনিত, দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছন। সেই অতি পরিচিত ও কাছের মানুযটিকে নিয়ে লেখা 'মতিউর রহমান গাঙ্গালী'র গ্রন্থ হলো -

"নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন"

গ্রন্থটির প্রকাশক জনাব এস. এম. লুৎফর রহমান, কৃষ্টি প্রকাশনা, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকালঃ একুশে বইমেলা, ১৯৯৯। মূল্যঃ ৬০.০০ টাকা। বইটি সাদা কাগজে ছাপা এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা আশি। প্রচ্ছদের উপরের অংশে রয়েছে লাল-সবুজ-নীল অক্ষরে লিখিত গ্রন্থটির নাম, আর ঠিক নীচেই পুরোটা জুড়ে রয়েছে অমর্ত্য সেনের চশমা পরিহিত বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্বপূর্ণ মুখমন্ডল। প্রচ্ছদ থেকেই আমরা গ্রন্থটির মূল উপজীব্য অনুমান করতে পারি।

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম, শৈশব, পড়াশুনা, গবেষণা কর্ম থেকে শুরু করে সুইডেনের রাজার হাত হতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি, দেশে-বিদেশে তার প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের শিক্ষা, দর্শন, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব প্রভৃতি এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য।

বইটি অমর্ত্য সেন - এর জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা বিশেষতঃ তাঁর শৈশবকাল, কর্মজীবন, গবেষণা কর্ম, দর্শন চিন্তা, অর্থনীতি চিন্তা, পুরস্কার প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত বিধায় ইহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণযোগ্য। একজন বাঙ্গালী যে তার মেধা, প্রজ্ঞা, চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা,

---

* অনুষ্ঠান সংগঠক, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা (২৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষনার্থী)

সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্বের বুকে বাঙ্গালী জাতিকে মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এমন একজন বড় মাপের অর্থনীতিবিদ, দর্শনবিদ বাঙ্গালীর জীবন-কর্মের উপর লিখিত গ্রন্থটি আমাদের আগামী প্রজন্মকে তাঁর পদাংক অনুসরনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে সন্দেহ নেই। এখানেই গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিহিত।

'মতিউর রহমান গাঙ্গালী' - নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন - গ্রন্থটির লেখক। যিনি একজন কলেজ শিক্ষক, প্রায় দেড় দশক ধরে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। জন্ম মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার বাঘাইয়াকান্দি গ্রামে। লেখক ১৯৭৬ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখে আসছেন ভিন্নমুখী চিন্তা, চেতনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও কলাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও লেখকের অর্থনীতির উপর বিচরণ রয়েছে। জীবনটাই অর্থনীতির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই রাজনীতি বিজ্ঞান ও ধন বিজ্ঞান মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সেই সূত্র ধরেই বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্যসেনের জীবন, তাঁর দর্শন, অর্থনীতি চিন্তা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটি পাঠকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন।

গ্রন্থটিতে লেখক প্রথমেই অমর্ত্য সেনকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দ্বিতীয় বাঙ্গালী হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

"নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন" - পুস্তকটি মূলতঃ একটি জীবন কাহিনী ভিত্তিক তথ্যবহুল গ্রন্থ। লেখক শুরুই করেছেন অমর্ত্য সেন - এর জীবনপঞ্জি দিয়ে, যেখানে তাঁর জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, ডাক নাম, পিতা-মাতার পরিচয়, ধর্ম, জাতীয়তা, বিবাহ, বর্তমান পেশা, শিক্ষা জীবন, চাকুরী জীবন, ফেলো/অনারারী ডি লিট প্রাপ্তি, তাঁর বিভিন্ন প্রকাশনাসমূহ ইত্যাদি রয়েছে। এ অংশ পাঠ করেই পাঠক এক নজরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অমর্ত্য সেন - এর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পরিচয় লাভে সক্ষম হবেন।

এরপর ছোট ছোট উপশিরোণামে অমর্ত্য সেন - এর জীবন ধারার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা করেছেন লেখক। প্রথমেই "অমর্ত্যের নামকরণ ও রবীন্দ্রনাথ" শিরোণামে অমর্ত্যসেন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর গুরুপল্লি, শান্তি নিকেতনে অমর্ত্যসেনের জন্ম, তার নামটি রাখেন বিশ্বকবি। সেদিন কবি অমিতা সেন (অমর্ত্যসেনের মা) কে বলেছিলেন - "ছেলের একটা অসাধারণ নাম দিলাম, দেখবি, একদিন ও সত্যিই অসাধারণ হয়ে উঠবে। তবে দেখিস, নামের বানানটি সেন ভুল করিসনে, অমর্ত্য নামের য-ফলাটা ঠিক দিবি কিন্তু।" ১৯৩৩ সালের ৩রা নভেম্বর শান্তি নিকেতনেই ঘটনাটি ঘটে - বিষয়টি 'আজকাল' এবং 'ভোরের কাগজ'

১৭ নভেম্বর'৯৮ইং সংখ্যায়, এবং ডঃ মোহাম্মদ হান্নান সম্পাদিত 'মর্ত্যের অমর্ত্যসেন' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে বলে লেখক এ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন।

অমর্ত্য সেন - এর মা অমিতা সেনের বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে; বাবা ডঃ আশুতোষ সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলায়। অমর্ত্য সেনের শৈশব কেটেছে সোনারং গ্রামে এবং মানিকগঞ্জে। পরে ঢাকার একমাত্র ইংরেজী স্কুল 'সেন্ট গ্রেগরি' - তে বেশ ক'বছর পড়ালেখা করেছিলেন দেশ ত্যাগের আগ পর্যন্ত। পঙ্কিল রাজনীতির আঘাতে ছিন্ন হয় বাংলা মায়ের দেহ, দেশ ভাগ হয় ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ছুরিকাঘাতে; তাই বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা - ত্যাগ করে অমর্ত্য সেন বেড়ে উঠতে থাকেন কলকাতায়। - এই বিষয়গুলি গ্রন্থের "শৈশবের মানিকগঞ্জ ও লারমিনি স্ট্রীট - শিরোণামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি অমর্ত্য সেন নিজেকে অনেক কিছুর সাথে জড়িত রাখতেন - ঘুড়ি উড়ানো, ফার্নিচার তৈরী, সাইকেল চড়ে ঘোরাঘুরি, সাঁতার কাটা, বই পড়া, ধাধা তৈরি, পত্রিকা-ম্যাগাজিনে লেখালেখি, নাটকে অভিনয়, আড্ডা দেয়া (যা আজও তার প্রিয়) খেলাধুলায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি। এতসব করেও পরীক্ষায় বরাবরই প্রথম হতেন অমর্ত্য সেন। কারণ তিনি ছিলেন প্রচন্ড মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র। রোজকার পড়া রোজ তৈরী করতেন। অমর্ত্য সেন শান্তি নিকেতন থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স পড়েন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পড়তে যান ক্যামব্রীজ বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ট্রিপল অনার্স পাশ করে অর্থনীতিতে প্রথম হন এবং পুরস্কার লাভ করেন। পরে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ইচ্ছায় যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে যোগ দেন। এরপর শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা। এর মাঝেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপিকা 'নবনীতা দেবসেনের' সাথে বিবাহ হয় এবং এ বিয়ে ভেঙ্গে গেলে ইতালির মেয়ে 'এভা' কে বিবাহ করেন। কিন্তু এভার মৃত্যুর পর বিবাহ করেন ফ্রান্সের 'এমা' কে যিনি অমর্ত্য সেনের বর্তমান স্ত্রী।

অমর্ত্য সেন বাবা ডঃ আশুতোষ সেনের সান্নিধ্য খুব কমই পেয়েছেন। তাঁর বাবা একজন নিরহংকারী, সৎ ও পন্ডিত মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি গ্রামের বাড়িতে গেলে দরিদ্র মানুষের মাঝে সময় কাটাতেন; গ্রামের সহজ সরল, অশিক্ষিত ও রুগ্ন মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন। ডঃ আশুতোষ সেন আজ নেই কিন্তু তার জগৎ বিখ্যাত পুত্র অমর্ত্য সেন পিতার সেই আদর্শের উপর দাঁড়িয়েই সারা বিশ্বকে জয় করেছেন কল্যাণমুখী অর্থনীতির ভিত্তিভূমিতে। নোবেল কমিটি অমর্ত্য

সেনের গবেষণার যে দিকটির মূল্যায়ণ করেছে - তা অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখক বই এর ৩২নং পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করেছেন।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সংবাদে অমর্ত্য সেনের, তাঁর মাতার ও তার স্ত্রী এমা'র প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল তা তুলে ধরতে লেখক ভুল করেননি। এছাড়া "অমর্ত্য নামের দ্যুতিঃ বাঙ্গালী লেখক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের চোখে" - এই শিরোণামে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক, সমাজ সেবক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাপ্তাহিকী, সাময়িকী ও ম্যাগাজিনকে দেয়া প্রতিক্রিয়া ও মতামতসমূহ সংকলিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষানের বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া 'নিউজ উইক' কে দেয়া সাক্ষাৎকারটি (যা অনুবাদ করেছিলেন সালমা ইয়াসমিন এবং যা প্রকাশ করে ভোরের কাগজ ২রা নভেম্বর'৯৮ তে) বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে অমর্ত্য সেন "লিঙ্গ বৈষম্যের সহিংসতাই নারীর প্রকৃত হত্যাকারী" - বলে মন্তব্য করেছিলেন।

গ্রন্থটিতে অমর্ত্য সেনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার ও সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত কিছু বক্তব্যকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা পাঠক সমাজকে তাঁর - দর্শন, দেশচিন্তা, সামাজিক সুরক্ষা, ভূমিসংস্কার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, দুর্ভিক্ষ ও মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। বইটির শেষ তিনটি উপশিরোনামে রয়েছে সুইডেনের রাজার হাত থেকে পুরস্কর গ্রহণের বর্ণনা, ঐতিহাসিক নিশি আহারের বর্ণনা ও ডঃ অমর্ত্য সেনের ঐতিহাসিক নোবেল ভাষণ - এর উপর সুন্দর ও মনোজ্ঞ উপস্থাপনা - যা পাঠ করলে পাঠকবৃন্দ নোবেল পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সত্যিকার সাধ গ্রহণ করতে পারবেন।

বইটি মূলতঃ তথ্য প্রদান রীতিতে রচিত। তবে শুধু তথ্য প্রদান নয়, সঙ্গে রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত ও পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রকাশিত অমর্ত্য সেন সম্পর্কে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, দর্শনবিদ, অর্থনীতিবিদদের মতামত ও তথ্যের সংকলন। গ্রন্থটির বর্ণনা তেমন সুবিন্যস্তভাবে ঘটেনি। গঠন বিন্যাস গতানুগতিক, প্রথমেই অমর্ত্য সেনের জীবনপঞ্জি, এরপর বিভিন্ন শিরোণাম ও উপশিরোণামে তথ্যভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে।

ছাপানোর ক্ষেত্রে সঠিক স্পেসিং ব্যবহার করা হয়নি এবং Composition -এর ক্ষেত্রে নান্দনিক মান বজায় রাখা হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপাতা জুড়ে ছাপানোতে অসুন্দর লেগেছে। বাক্যে ব্যবহৃত ভাষা সাবলীল হলেও শব্দ চয়নে ক্ষেত্র বিশেষে বিচক্ষণতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা লেখাটিকে কিছু সাধারণ মানে নামিয়ে এনেছে।

বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জীবনীর উপর ভিত্তি করে বাংলায় লেখা গ্রন্থটি যথেষ্ঠ বাহবা পাওয়ার যোগ্য। লেখক অমর্ত্য সেনকে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সহজ, সুন্দর, সাবলীল ও মনোজ্ঞ বর্ণনায় তুলে ধরতে চেষ্টার ক্রুটি করেননি। যদিও বইটির গঠন বিন্যাস ও মুদ্রনে সামান্য ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে; তথাপি গ্রন্থটি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী প্রজন্মের কাছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই।

লেখক মতিউর রহমান গাঙ্গালী অমর্ত্য সেনের একজন গুনমুগ্ধ ভক্ত। একজন বাঙ্গালী হিসাবে আর একজন স্বদেশী বাঙ্গালীর কর্মের প্রাপ্তিকে নিজের বলেই মনে করেছেন এবং গর্ববোধ করেছেন। বিশেষ করে লেখকের জন্মভূমিতে অমর্ত্য সেনের প্রানের সূত্রপাত ও জীবনের পথচলা শুরু; তাই তাকে বাঙ্গালী পাঠক সমাজের নিকট নিবিড়ভাবে পরিচয় করাতে লেখকের এ প্রচেষ্টা এবং বলা যায় তিনি (লেখক) এ প্রচেষ্টায় বেশ সফল হয়েছেন।

বাঙ্গালী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয় আমাদের আজও করে পুলকিত, অন্যদিকে অমর্ত্য সেনের নোবেল বিজয় চোখের সামনে সতেজ গোলাপ হয়ে যেন আমাদের ছুঁয়ে যায়, স্পর্শ করে এবং ঘ্রাণ দেয়। রবীন্দ্রনাথের পর অমর্ত্যসেন পর্যন্ত অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে নোবেল পুরস্কার কুড়িয়ে আনতে একজন বাঙ্গালীর, তাই লেখক যথার্থ বলেছেন - "অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার অর্থাৎ জগতের সর্বোচ্চ সম্মানটুকু বাঙ্গালী ভোগ করবে অনন্তকাল।"

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষান্মাষিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এ'টি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- ❒ লেখা সাদা কাগজে (১১$\frac{১"}{২}$ ×৮$\frac{১"}{২}$) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে টাইপ করা হতে হবে;
- ❒ মূল কপিসহ পান্ডুলিপি, তিন প্রস্ত সম্পাদকের বরাবর পাঠাতে হবে;
- ❒ লেখার সাথে আলাদা কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকতে হবে;
- ❒ প্রবন্ধ ৪০ পৃষ্ঠা, টীকা ২০ পৃষ্ঠা ও পুস্তক সমালোচনা ১০ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়;
- ❒ নিবন্ধে প্রতি পৃষ্ঠার নীচে নম্বরযুক্ত পাদটীকা থাকতে হবে। পাদটীকায় লেখক, গ্রন্থ, স্থান, প্রকাশক, বৎসর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইস্যু সংখ্যা, বৎসর ও পৃষ্ঠা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;
- ❒ লেখাটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি - এ মর্মে লেখককে লেখা জমা দেয়ার সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে;
- ❒ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন;
- ❒ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠা লেখার জন্য লেখককে ২০০/- টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেসার্স ইছামতি অফসেট প্রেস, ১/১ ডিআইটি রোড, হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
(ষান্মাষিক বাংলা জার্নাল) টাঃ ২০/-
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা টাঃ ৪০/-

২। Bangladesh Journal of Public Administration
Vol-1, No. 1&2
Vol-2, No. 1&2
Vol-3, No. 1&2 টাঃ ২০/-
Vol-4, No. 1&2 টাঃ ৪০/-
Vol-5, No. 1&2
Vol-6, No. 1&2
Vol-7, No. 1&2

৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service টাঃ ৪০/-

৪। Career Planning in Bangladesh টাঃ ১২০/-

৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Gonoshasthaya Kendra টাঃ ৪০/-

৬। Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৭। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে মহিলা টাঃ ১২০/-

৮। Sustainability of Primary Education Project: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৯। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh টাঃ ১০০/-

১০। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (board binding) টাঃ ১৫০/-

(খ) Decentralization & Peple's Participation in Bangladesh (Paper back) টাঃ ১২৫/-

১১। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা টাঃ ৭০/-

১২। Social and Administrative Research in Bangladesh টাঃ ৭০/-

১৩। Problems of Municipal Administration টাঃ ২৮/-

১৪। Bangladesh Public and Senior Civil Servants টাঃ ৫০/-

১৫। প্রশাসনের মূলনীতি টাঃ ১৮/-

১৬। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ টাঃ ৬/৫০

১৭। সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা টাঃ ৬/৫০

১৮। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি টাঃ ৬/৫০

১৯। Famine Manual টাঃ ৭/-

২০। The Deputy Commissioner in East Pakistan টাঃ ১৬/-

২১। Social Change and Development Administration in South Asia টাঃ ৪৫/-

২২। Hospital Administration টাঃ ১৮/-

২৩। District Administration in Bangladesh টাঃ ২২/-

২৪। Hand Book for the Magistrates টাঃ ১০০/-

২৫। লোক-প্রশাসন সাময়িকী
১ম সংখ্যা-১৫তম সংখ্যা টাঃ ১৫/-

২৬। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি টাঃ ১২৫/-

২৭। Bureaucracy in Bangladesh Perspective টাঃ ৫০০/-

২৮। Limiting the Rule of State Prescription of the World Bank and the Bangladesh Economy টাঃ ১০০/-

২৯। The Assessment of EL. Nino Impacts and Responses টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।